কাশ্মীরের যুবকদের খোলা চিঠি
তোমরা যদি ভারতকে নাও পছন্দ করো তবুও জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রাখাই তোমাদের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক
— পৃঃ - ২৭

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ভারতের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিশু-কিশোরদের মনের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ
— পৃঃ- ৩১

৬৮ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ৯ মে ২০১৬।। ২৬ বৈশাখ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

নীতি না রাজনীতি ?

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ২৬ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৯ মে - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

পশ্চিমবঙ্গকে ৩৯ বছরের কুশাসন শ্মশানে পরিণত করেছে
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : চোরকে চড় মারুন। আইন নিজের হাতে তুলে নিন। তাহলে তো ... ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

কমিউনিজম ও জাতের বজ্জাতি ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১২

বিহারেও মদ নিষিদ্ধ— নীতি না শুধুই রাজনীতি?
▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১৪

সেকালে মদ্যপানের বিরুদ্ধে সচেতনতা
▯ অরূপ নাগচৌধুরী ▯ ১৬

পশ্চিমবঙ্গ! নাকি পশ্চিম বাংলাদেশ ▯ নবারুণ দে ▯ ২০

গো-বংশ ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ
▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ২১

শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকর প্রভু অদ্বৈতাচার্য
▯ জনৈক ভক্ত ▯ ২৩

কাশ্মীরের যুবকদের খোলা চিঠি : তোমরা যদি ভারতকে পছন্দ নাও করো তবু জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রাখাই তোমাদের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক
▯ চেতন ভগত ▯ ২৭

অসুরবাবা ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২৯

ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিশু-কিশোরদের মনের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ ▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ৩১

আমার দেখা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়
▯ অজিত কুমার বিশ্বাস ▯ ৩৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬**
▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **খেলা : ৩৯**
▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বৈদিক সরস্বতী নদী

ভারতের নদীমাতৃক সভ্যতার একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে সুপ্রাচীন সরস্বতী নদী। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অন্যান্য নানাবিধ সূত্র থেকে অবলুপ্ত বৈদিক সরস্বতী নদীর গতিপথ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে ভারতবর্ষের নদী-মাতৃকার আরেকটি গৌরবময় দিক ইতিহাসের পাতা আলোকিত করছে। লিখেছেন — অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় ও স্বপন দাশগুপ্ত। থাকছে অন্যান্য বিষয়ও।

দাম একই থাকছে ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংরক্ষণের নূতন ভাবনা

সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকর দেশের অবহেলিত শ্রেণীর জন্য সংবিধানে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি আশাপ্রকাশ করিয়াছিলেন ইহা দেশে সমরস সমাজ নির্মাণে সহায়ক হইবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভোটলোলুপ রাজনীতিকদের হাতে পড়িয়া ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। এখন শিক্ষা ও চাকুরিতে বাড়তি সংরক্ষণের দাবিতে দেশ জেরবার হইতেছে। দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বহু পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছেন জাতপাতের ভিত্তিতে না করিয়া আর্থিক অনগ্রসরতার দৃষ্টিতে সংরক্ষণের কথা ভাবিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও কায়েমি স্বার্থের লোকেরা শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের কথা ভাবিয়া সরল মানুষদের মনে জাতিগত হিংসার বীজবপন করিয়া চলিতেছে। আজ রাজনীতিকদের 'দলিত' শব্দটি বড়ই লোভনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মায়াবতী, লালুপ্রসাদ নিজেদের ইহার বড় প্রবক্তা মনে করিতেছেন। এদেশের কমিউনিস্টরা দলিতদের লইয়া চিরকালই রাজনীতির প্রয়োজন মিটাইয়া আসিয়াছে। বর্তমানে তাহাদের এই রাজনীতি বিশ্বের দরবারে ভারতকে অকারণে অস্বস্তিতে ফেলিবার চক্রান্ত মাত্র। কিন্তু কেরলে সাম্প্রতিকতম দুইটি ঘটনায় তাহাদের দলিতপ্রেমী মুখোশ ঘুচিয়াছে। স্পষ্ট হইয়াছে, ভারতবর্ষকে অপদস্থ করিবার তাহাদের বহুবিধ ফিকিরের মধ্যে এই 'দলিতপ্রেম' অন্যতম। পরিস্থিতি পাল্টাইবার জন্য এক্ষণেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ লওয়া প্রয়োজন।

এমতাবস্থায় গুজরাট রাজ্য দেশকে সঠিক পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। গুজরাট সরকার অর্থনৈতিক ভিত্তিতে পিছাইয়া পড়া সমস্ত শ্রেণীকে সংরক্ষণের আওতায় আনিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। জাতপাতের ভিত্তিতে নহে। যে সমস্ত পরিবারের বার্ষিক উপার্জন ছয় লক্ষ টাকার কম তাহারা এই সংরক্ষণের আওতায় পড়িবে। ইহার জন্য গুজরাট সরকার খুব শীঘ্র অধ্যাদেশ আনিতে চলিয়াছে। সেই অধ্যাদেশ খুব সহজেই আইনে পরিণত হইতে পারিবে কী না তাহা এখনই বলা যাইতেছে না। কেননা স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরা গুজরাট সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানাইতে পারে। তাহারা যুক্তি দেখাইবে যে, সংবিধানে আর্থিক ভিত্তিতে সংরক্ষণের কথা বলা হয় নাই। এই কথা সত্য যে, সংবিধানে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সংরক্ষণের কোনো ধারা নাই। কিন্তু সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশ রহিয়াছে যে, জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ৫০ শতাংশের অধিক হইবে না। তাহা সত্ত্বেও কোনো কোনো রাজ্য তাহা ৫০ শতাংশ অতিক্রম করিয়াছে।

সংরক্ষণ বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন এই জন্যই যে, যেইরূপে গুজরাটে প্যাটেল সমাজ সংরক্ষণের দাবি করিয়া চলিয়াছে সেই রূপে অন্য অনেক সমাজ যাহারা পিছাইয়া পড়া শ্রেণীর মধ্যে পড়িবেই না তাহারাও সংরক্ষণের দাবি করিতেছে। এইরূপ সমাজের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলি তাহার লাভ উঠাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে দেশে সামাজিক সমতা বিঘ্নিত হইতেছে। সংবিধান প্রণেতারা সামাজিক সমরসতা আনয়নের জন্যই সংবিধানের ধারায় বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই পরিস্থিতিতে সংরক্ষণের বিষয়ে নূতন ভাবনার সঙ্গে অগ্রসর হওয়া সময়ের চাহিদা অনুভূত হইতেছে। সমাজের সবাইকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সেই বিষয়ে উদারচিত্তে ভাবনার সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে জাতিগত ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ভিত্তিতে সংরক্ষণের সাংবিধানিক মান্যতা পাইবার। দেশে সমতার পরিবেশ নির্মাণ করিবার জন্য ইহা ব্যতীত অন্য কোনো পথ নাই। প্রাচীন ভারত এই ভাবেই গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতপাতের ভেদাভেদ আমাদের দেশে বড়জোর এক হাজার-দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কোনোভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল। কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী তাহাতে ইন্ধন জোগাইয়াছিল এবং এখনও জোগাইতেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বদল হইতেছে। সংবিধানেরও এই বিষয়ে সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। সুখের বিষয়, দেশের মধ্যে অগ্রগামী রাজ্য গুজরাট সেই পথে চলিবার প্রয়াস শুরু করিয়াছে।

সুভাষিতম্

তুষ্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা ঘনগর্জিতে।
সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিষু।। (চাণক্যনীতি)

ভোজনে খুশি হন ব্রাহ্মণগণ। ময়ূর খুশি হয় মেঘের ডাক শুনে। সাধুগণ ঈশ্বরের করুণা পেলে খুশি হন। দুর্জনেরা খুশি হয় অন্যের বিপদ ঘটিয়ে।

সঙ্ঘের কাজের পরিধির বিস্তৃতি প্রগতিশীল বিকাশ : দত্তাত্রেয় হোসবালে

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ শ্রী দত্তাত্রেয় হোসবালে সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া টুডে'-র বরিষ্ঠ সম্পাদক উদয় মাহারকরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে কয়েকটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ সঙ্ঘের মূল ভাবাদর্শের পরিবর্তন নয়, বরং তিনি একে সংগঠনের প্রগতিশীল বিকাশ হিসেবেই দেখতে পছন্দ করেন। সংক্ষিপ্ত এই সাক্ষাৎকারটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

■ **রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নতুন সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কি তার আমূল বদলে যাবার ইঙ্গিত?**

■ আমি মনে করি না। সঙ্ঘ তার মূল মতাদর্শকে অক্ষত রেখেই সময়ের সঙ্গে সবসময় বিবর্তিত হচ্ছে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারজীর মধ্যে এই দূরদর্শিতা ছিল। তাই এই অগ্রগতিকে আমি প্রগতিশীল বিকাশই (Progressive unfoldment) বলব। কেননা এই প্রগতি ক্রমাগত বিবর্তনের কারণে ঘটছে। আগে আমাদের সামাজিক কাজের বিস্তার একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু সমাজের মৌলিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজের পরিধিও বেড়েছে। এখন আমাদের কাজের পাঁচটি বিভাগ রয়েছে— গ্রাম বিকাশ বা গ্রামীণ উন্নতি, সামাজিক সমরসতা বা সামাজিক একাত্মতা, গো-সেবা বা গো-পরিচর্যা, ধর্মজাগরণ বা ধর্মীয় সচেতনতা জাগ্রত করে ধর্মান্তরকরণ রোধ করা এবং কুটুম্ব প্রবোধন বা হিন্দু পরিবারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

কেন্দ্র এবং প্রান্ত স্তরে এগুলির কাজকর্ম পরিচালনা করেন আলাদা আলাদা বিভাগীয় প্রধান যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সঙ্ঘের সঙ্গে সংযুক্ত। এগুলি সবই অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা যেখানে সঙ্ঘ সম্পর্কিত নয় এমন ব্যক্তিরাও সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক সমরসতার ক্ষেত্রে আমাদের কার্যকর্তারা অবহেলিত সম্প্রদায়সহ একটি গ্রামের জন্য একটি মন্দির, একটি শ্মশান, একটি জলের উৎসের লক্ষ্যে কাজ করছেন।

■ **আর কি কি পরিবর্তন আপনি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন?**

■ গণমাধ্যমের সঙ্গে সঙ্ঘের সংযোগ স্থাপন এরকম আরও একটি ক্ষেত্র। আমরা প্রচারমাধ্যম থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতাম, কিন্তু ১৯৯৪ সালে জনসংযোগ বিভাগ চালু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম। কেননা আমরা চেয়েছিলাম যে সঙ্ঘের সমুচিত বিষয়গুলি গণমাধ্যম, জনগণ এবং সহমতপোষণকারী লোকেদের কাছে পৌঁছক। সুতরাং সঙ্ঘের মধ্যে বিবর্তন হয়ে চলেছে বা 'পরিবর্তন' সংগঠিত হচ্ছে বলে ভাবা ঠিক হবে না, কারণ মূলনীতি অপরিবর্তিতই রয়েছে। সেবাকার্যও এখন পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। দু'দশকের মধ্যেই এই কাজ সম্পূর্ণভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। আগে এই কাজ খুব একটা পরিকল্পিত ভাবে করা হোত না। এখন সারা দেশে সেবাকাজ দেখাশোনা করার জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী নামে একটি স্বীকৃত সংগঠন রয়েছে। বর্তমানে এর মাধ্যমে সঙ্ঘের প্রায় দেড় লক্ষের মতো সমাজ সেবার কার্যক্রম চলছে!

(সৌজন্যে ইন্ডিয়া টুডে)

মন্দিরে কোটি টাকার হিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শিরডি সাঁইবাবার মন্দিরের হুণ্ডিতে (দানবাক্স) অহরহই পড়ে সোনা, রুপা ও বিভিন্ন দামি পাথর। গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে এবছরের ৩১ তারিখ পর্যন্তই ভক্তরা দান করেছেন ২২৩টি হিরে, মুক্তো ও দামি রত্ন। কিন্তু গত ২১ এপ্রিল হুন্ডি খোলার পর চমকে যায় মন্দির কর্তৃপক্ষ। প্রায় কোটি টাকার দুটি হিরের হার কোনো এক ভক্ত হুণ্ডিতে ফেলে গেছে। সরকারি খাতায় নথিভুক্ত মূল্যায়নকারী মারফত দাম যাচাইয়ের পর জানা যায় হিরে দু'টির মূল্যই ৯২ লাখ টাকা। একটি ৬.৬৭ ক্যারাট (ব্রিলিয়ান্ট কাট) এবং অন্যটি ২.৫ ক্যারাট (এমারেল্ড কাট)। সাধারণত কোনো বড় দান সরাসরি মন্দিরের ট্রাস্টির হাতেই দেওয়া হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম হলো। বর্তমানে মন্দির ট্রাস্ট পরিচালিত হয় বম্বে হাইকোর্ট কমিটির দ্বারা। ট্রাস্টের বর্তমান সিইও বাজিরাও শিন্ডে জানান কোর্ট ঠিক করবে হিরেগুলো নিয়ে কী করা হবে। দান এবং সম্পদের বিচারে দেশের শীর্ষস্থানীয় পাঁচটি মন্দিরের একটি শিরডির সাঁইমন্দির। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাঁইবাবার সমাধির একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী বছর ২০১৭ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত পুণ্যতিথি উৎসব পালন করার পরিকল্পনা করছে ট্রাস্ট।

মহাকাশের উদ্দেশে ‘নাবিক’-এর যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার উৎক্ষেপিত হলো দেশের সপ্তম নেভিগেশনাল উপগ্রহ আই আর এন এস এস ওয়ান জি। এদিন বেলা বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে মহাকাশে পাড়ি দিল উপগ্রহটি। পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল (পি এস এল ভি) সি ৩ রকেটের পিঠে চড়ে ৪৪.৪ মিটার লম্বা ও এক হাজার চারশো পঁচিশ কেজি ওজনের উপগ্রহটি যাত্রা শুরু করে। এর ফলে জিপিএস প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে ভারত। জিপিএস প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে এই নিয়ে সাতটি উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে। ভারতে এই সিরিজের প্রথম নেভিগেশন স্যাটেলাইট আই আর এন এস এস ১-এর উৎক্ষেপণ হয়েছিল ২০১৩ সালে ১ জুলাই। এই প্রকল্পটির জন্য ভারতীয় মূল্যে খরচ হয়েছে ১০২০ কোটি টাকা এবং এটি বারো বছর পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকবে। নিজের দপ্তরে বসে এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণ দেখে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি এর নামকরণ করেন ‘নাবিক’। যথার্থই তাঁর নামকরণ। আকাশপথ ও জলপথে নেভিগেশনের ক্ষেত্রে সহায়তার পাশাপাশি সড়কপথের ক্ষেত্রেও তা খুব কার্যকরী হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। যানবাহন ট্র্যাক

করা ছাড়াও বিপর্যয় মোকাবিলা, ম্যাপিং এবং ভিস্যুয়াল ও ভয়েস নেভিগেশনেও সুবিধা হবে। মোবাইলেও এর পরিষেবা পাওয়া যাবে।

বেফাঁস মন্তব্য করে বিপাকে পড়লেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দক্ষিণ কলকাতায় ভোটের প্রাক্কালে পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত ‘ডন’ পত্রিকায় কলকাতার গার্ডেনরিচ অঞ্চলের ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, বন্দর বিধানসভা এলাকার প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম সাধ করে তাঁর স্বধর্মের এক পাকিস্তানি সাংবাদিক মালেহা হামিদ সিদ্দিকীকে তাঁর এলাকার দেওয়াল লিখন, লোকলস্কর, প্রচারের বহর সব ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন। উর্দুভাষী মুসলমান প্রধান এলাকায় ফিরহাদ যে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক প্রচারের ওপর জোর দিয়েছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে দেওয়ালে দেওয়ালে উর্দু ভাষায় লেখা হয়েছিল ‘ফিরহাদ হাকিমকো কাসির ভোটোঁ সে কাময়াব করেঁ। উরস গরিব নওয়াজ আপ তামাম হজরতসে গুজারিশ হ্যায়...’ইত্যাদি। খাঁটি উর্দুতে ধর্মঘেঁষা আবেদন দেখে শুনে ওই সাংবাদিক বলে ফেলেন ‘‘ফিরহাদ আপনি ঠিকই বলেছেন এলাকাটিকে মিনি পাকিস্তান বললে অত্যুক্তি হবে না।’’ এর পর ওই সাংবাদিককে ঘিরে এলাকাবাসী ধর্ম্মো ভাই-বোনেদের বেরাদরি আরও চাগাড় দেয়। ওই সাংবাদিক লিখেছেন, ‘‘আমাকে ফিরহাদের সঙ্গে ডায়েরি হাতে খোঁজ খবর নিতে দেখে তাঁরা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন আমি কোন চ্যানেলের প্রতিনিধি। আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি শুনে তাঁরা আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে থাকা তাঁদের জাতভাই বা আত্মীয়দের কথা জানাতে থাকেন।’’

প্রসঙ্গত, ওই মহল্লায় ঢোকার ঠিক আগেই ফিরহাদ ওই মহিলা সাংবাদিককে অবাক করে দিয়ে বলেন, ‘‘চলুন আমি এই বার আপনাকে একটা মিনি পাকিস্তান দেখিয়ে আনছি।’’

ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যে থেকে সে দেশেরই একটি অঞ্চলকে সরাসরি পাকিস্তানের এক প্রথম শ্রেণীর সংবাদ প্রতিনিধির কাছে পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করে গর্ববোধ করা এই নারদ ঘুষকাণ্ডে অভিযুক্ত মন্ত্রীকে বহু কষ্টে ফোনে ধরা গেলে আত্মরক্ষায় তিনি বলেন, ‘‘যদি নরেন্দ্র মোদী চারবার পাকিস্তান সফর করতে পারেন তাহলে তাঁর এই মিনি পাকিস্তান তুলনায় তিনি কোনো দোষ দেখেন না।’’

এখন বিজেপি প্রশ্ন তুলেছে, তাহলে ফিরহাদ হাকিম কি মনে করেন, নির্বাচন হচ্ছে মিনি পাকিস্তানে না ভারতে? বিজেপির তরফে তাঁকে পত্রপাঠ দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনে যথাযথ অভিযোগও জানানো হয়েছে।

সংশোধনের আর্জি শহিদ পরিবারের

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বইতে ভগৎ সিং-রা এখনও 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী'

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রায় দু'দশক হয়ে গেল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রেফারেন্স বইতে শহিদ ভগৎ সিং এখনও 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' রয়ে যাওয়ায় ভগৎ সিংয়ের পরিবারের লোকেরা দ্বারস্থ হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে লেখা একটি চিঠিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যোগেশ ত্যাগীর সঙ্গে এক বৈঠকে শহিদের পরিবারের লোকজন এ ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা শ্রীমতী ইরানির কাছে বইয়ের তথ্যটির ব্যাপারে 'যথোপযুক্ত পরিবর্তন'-এর জন্য নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। বইটি হলো 'ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল ফর ইনডিপেনডেন্স'। লেখক দুই বামপন্থী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র ও মৃদুলা মুখার্জি। বইতে ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য

সেন এবং অন্য বিপ্লবীদের 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে এর ২০তম অধ্যায়ে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকেও 'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অত্যাচারী বৃটিশ শাসক স্যান্ডার্স হত্যাও লেখকদ্বয়ের কাছে 'সন্ত্রাসবাদী কাজ'।

ভগৎ সিংয়ের পরিবারের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর উপাচার্য ত্যাগী জানিয়েছেন যে বইটি যদিও বেশ পুরোনো এবং এখনও পর্যন্ত কেউ সেভাবে অভিযোগ না জানানোয় সংশোধনের কাজ হয়নি। তবে এবারে সমস্যার দ্রুত সমাধানের দিকে এগোবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তিনি আরও বলেছেন, এটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নয়, রেফারেন্স বই হিসেবেই পড়ানো হয়।

গত ২৭ এপ্রিল লোকসভাকেও বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন ভগৎ সিং 'বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী'-তে পরিণত হলেও, ওই বইতে কংগ্রেস নেতৃবর্গ কিন্তু 'ক্যারিশ্মাটিক' হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি দাবি তোলেন সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কী ধরনের পাঠ্যপুস্তক হওয়া উচিত, তা নিয়ে লোকসভায় বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গত, বামপন্থী ঐতিহাসিকরা বরাবরই ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি তাদের বিরাগ মনোভাব দেখিয়েছেন। বিপ্লবীরা তাদের কাছে কখনও 'সন্ত্রাসবাদী'র বেশি মর্যাদা পাননি।

আই এস-এর হামলার ছক ভারত এবং বাংলাদেশে

ইসলামিক স্টেটের সন্ত্রাসবাদীরা ভারত এবং বাংলাদেশে আরও ভয়ঙ্কর হামলার ছক কষছে। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য বাংলাদেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু হিন্দু আর অন্যান্য বিদেশিরা। মনে করা হচ্ছে এর ফলে স্থানীয় মুসলমান নেতাদের সন্ত্রাসবাদে উৎসাহিত করা যাবে এবং মৌলবাদকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব হবে। মার্কিন সংস্থা 'স্ট্রেট ফর'-এর সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে খবরটি। সংস্থার মুখপত্র 'দাবিক'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় ইসলামিক স্টেটের বাংলাদেশ শাখার প্রধান শেখ আবু ইব্রাহিম আল হানিফ সে দেশে তাদের সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছে। সে জানিয়েছে, কৌশলগত নানা কারণে বাংলাদেশ তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নানা কারণের একটি হলো, বাংলাদেশে ঘাঁটি গাড়তে পারলে পূর্ব ভারত ও মায়নামারে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালানো সহজ হয়ে যায়। ইতিমধ্যেই ইসলামিক স্টেট বাংলাদেশে বেশ কিছু হামলা চালিয়েছে। যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মূলত হিন্দুরা। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করাই আই এস-এর লক্ষ্য। তাই এবারের হামলা হবে আরও বড়ো— আরও ভয়ঙ্কর। যাতে 'লক্ষ্যপূরণ' এবং সন্ত্রাসবাদের বিপণন দুইই তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

'দাবিক'-এর এপ্রিল সংস্করণে, আল হানিফ বাংলাদেশের কোথায় কোথায় হামলা হতে পারে তার একটি তালিকাও দিয়েছে। যার মধ্যে কয়েকটি ইতিপূর্বেই ঘটে গেছে, কয়েকটি এখনও বাকি। এবারেও প্রথম ও প্রধান টার্গেট হিন্দুরা। তারপর অন্য সংখ্যালঘুরা। রিপোর্টে প্রকাশ, বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এবং কয়েকজন সন্ত্রাসবিরোধী নেতার ওপরেও আই এস নজর রাখছে। আল হানিফ জানিয়েছে, ইরাক ও সিরিয়ায় যে-সব বাংলাদেশি লড়াই করছে তারাই বোমা তৈরির দক্ষ লোক দিয়ে আই এস-কে সাহায্য করছে।

অন্যদিকে, সমকামীদের অধিকার নিয়ে লড়াই করা সমাজকর্মী ও তার বন্ধুকে হত্যার দায় স্বীকার করেছে আল কায়দা। তাদের বাংলাদেশ শাখার প্রধান আনসার আল ইসলাম সম্প্রতি দাবি করেছে, সমাজকর্মী জালহাজ মান্নান এবং তার বন্ধু তনয় মজুমদার সমকামকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছিলেন বলে আলকায়দাই তাদের হত্যা করেছে। জানা গেছে জালহাজ মান্নান একটি মার্কিন সংস্থায় কর্মরত ছিলেন আর তনয় ছিলেন একজন নাট্যকর্মী।

হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৩০ এপ্রিল দুপুরে ঢাকার পার্শ্ববর্তী টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার ডুবাইল কালীবাড়ি বাজারে নিখিলচন্দ্র জোয়ারদার (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে খুন করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। কিছুদিন আগে আশ্রমের মধ্যে গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ক্রমে বেড়েই চলেছে। ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসেই প্রায় তিন গুণ হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। গত তিন মাসে ৮ হাজার ২৫০টি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে নিহত, আহত, অপহরণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ, গণধর্ষণ, জমিজমা, ঘরবাড়ি, মন্দির, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছেদের ঘটনা রয়েছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে হিন্দু নির্যাতনের বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের আইন পাশের দাবি জানিয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ।

পরিষদের অভিযোগ— হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক পরিচয় ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করছে সন্ত্রাসীরা। কয়েকটি ঘটনায় ক্ষমতাসীনদের দলের নেতা ও কর্মীরা সরাসরি যুক্ত বলে পরিষদের অভিযোগ।

উবাচ

“মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা বহু সাফল্য লাভ করেছেন। মহাকাশ বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনা সম্ভব।”

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

আই আর এন এস এস-১-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য ইসরোর বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানানোর প্রসঙ্গে।

“বালুচিস্তানের স্বাধীনতার জন্য ভারত ও বিশ্বের দেশগুলির সহযোগিতা আশা করছি। এখন সময় এসেছে বিশ্বের দেশগুলির, আই এস আই-য়ের অত্যাচারে অত্যাচারিত বালুচ মহিলা ও শিশুদের আর্ত চিৎকারে কান দেওয়ার।”

প্রফেসর নায়েলা কাদরী বালুচ
ওয়ার্ল্ড বালুচ উইমেন ফোরামের নির্দেশক।

“কংগ্রেস তাদের শাসনকালে আদর্শ, অগাস্তা ও কলগেটের মতো এত বড় বড় ঘোটালা করেছে যে, এখনও জাতীয়স্তরে হেড লাইন না হওয়ার জন্য তাদের খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে।”

সম্বিৎ পাত্র
বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র।

“পৌরী, টেহরি, উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, আলমোড়া, পিথোরগড়, নৈনিতালের দাবানল অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। জঙ্গলের এক ইঞ্চি জমিও আর কাউকে বেআইনিভাবে দখল করতে দেওয়াল হবে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।”

প্রকাশ জাভড়েকর
কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী

“আদালত রাজনীতি করার জায়গা নয়।”

কে পি ইন্দিরা,
ভেকেশান ডিস্ট্রিক্ট জজ
বিরোধী দলনেতা

ভি. এস অচ্যুতানন্দের বিরুদ্ধে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চণ্ডীর মামলা প্রসঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গকে ৩৯ বছরের কুশাসন শ্মশানে পরিণত করেছে

প্রায় চার দশক পরে এই প্রথম কোনো বিধানসভার ভোট এতটা নির্বিঘ্নে মোটামুটিভাবে শান্তিতে সমাপ্ত হয়েছে। ফলাফল কী হবে সেটা অন্য কথা। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে মানুষ তার নিজের ভোট নিজে দিতে পেরেছে। নিজের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কথাটা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল গত ৩৯ বছর এই রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গে ভোট মানেই লুম্পেন গুণ্ডা সমাজবিরোধীদের দাপাদাপি। বোমা পিস্তলের ঝলকানি, বারুদের গন্ধ। অতীতে নির্বাচন কমিশন এই রাজ্যে অবাধ ভোটের গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিশ্রুতিই ভোটের দিন কার্যকর করা হয়নি। শাসকদলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলদাস প্রশাসন এবং পুলিশ একতরফা ছাপ্পা ভোট করিয়েছে। মানুষ ভোট দেয়নি। বরং বলা ভাল যে দিতে দেওয়া হয়নি। বামেরা দাবি করতো যে বাংলার মাটি তাদের দুর্জয় ঘাঁটি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেখা গেল সারা রাজ্যে তাদের ইঁদুরের গর্ত ছাড়া লুকোবার অন্য কোনো স্থান নেই। তৃণমূল ক্ষমতা দখলের পর দলের নেত্রী স্লোগান দেন যে তাঁর দল মা-মাটি-মানুষের সরকার। ক্ষমতার প্রথম বছরেই বোঝা গেল দলটি আসলে ধান্দাবাজ চোর কপটদের সরকার। দলের ছোট বড় মেজ সব নেতা-নেত্রী তাদের চারপুরুষের আখের গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। উন্নয়নের নামে কাটমানির খেলা। রাজ্যের সমস্ত চিটফাণ্ডের মালিকদের অবিরাম দোহন শুরু হয়ে গেল। পথে বসলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এদের রক্তজল করে জমানো টাকা মেরে দিয়েই তৃণমূলের এত রমরমা। সিপিএম নেতাদের টালির ঘরকে তিনমহলা রাজপ্রাসাদ বানাতে সময় লেগেছিল ৩৪ বছর। তৃণমূল নেতারা প্রথম দু'বছরেই বস্তির চালাঘর থেকে বহুতল আবাসনের সুপার ডিলাক্স ফ্ল্যাটে বসবাস শুরু করে দেয়। দলের নেত্রী প্রায়ই বলেন যে ১০০ বছরের উন্নয়ন তিনি পাঁচ বছরে করেছেন। আসল কথাটা হচ্ছে, পাঁচ বছরেই তিনি দলের ল্যাংড়া হুলোদের ১০০ বছরের কামাই করে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনাদের

গূঢ় পুরুষের কলম

নিশ্চিত মনে আছে যে ক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসার পরে দলনেত্রী প্রতিদিন নিয়ম করে বলতেন, বামফ্রন্ট সরকার ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ঋণ চাপিয়ে রেখে গেছে। সেই ঋণ শোধের দায় মাথায় নিয়ে তাঁকে উন্নয়নের কাজ করতে হচ্ছে। ক্ষমতার তৃতীয় বছর থেকে তিনি আর বামেদের লক্ষ কোটি টাকার ঋণের কথা বলে কাঁদুনি গান না। কেন? তবে কি বাম আমলের ঋণ তিনি কেন্দ্রকে শোধ করে দিয়েছেন? তাও না। তবে? মাননীয়া নেত্রী সোনার খনির সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর সরকার ঋণপত্র ছড়িয়ে বাজার থেকে গত সাড়ে চার বছরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। উন্নয়নের নামে বামেদের ১ লক্ষ কোটি টাকা ধারকর্জ করতে পুরো তিনটি দশক লেগেছিল। তৃণমূল সরকার পাঁচ বছরেই সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচনী যুদ্ধে জিতে যারাই এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে তাদেরই ঋণের এই দায় ঘাড়ে নিতে হবে। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলে 'debt trap'। ঋণের ফাঁদ। একটা ঋণের দায় শোধ করতে সরকার খোলা বাজারে দশটা ঋণ করেছে। পাঁচ বছরে উন্নয়নের নামে রাজ্যটাকে শুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে তৃণমূল সরকার। তাই বলছি, যাঁরাই ক্ষমতায় আসুন তাঁদের পক্ষে ঋণের ওই মরুভূমিতে জল সেচন সম্ভব নয়। তৃণমূল এখন পালাতে পারলে বাঁচে। নীরস মা-মাটি-মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার আর কিছু নেই। আখের গোছানো হয়ে গেছে। এখন মানে মানে কেটে পড়াই ভাল। জোটপন্থীরা স্বপ্ন দেখছেন ক্ষমতা দখলের। ভাবছেন ছিবড়ে পিষে রস বার করবেন। অথচ বাস্তব হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গকে ৩৯ বছরের কুশাসন শ্মশানে পরিণত করেছে। যে শ্মশানে চিতা জ্বালাবার কাঠটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। তৃণমূল সরকার বাংলাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নৈরাজ্য স্থাপন করেছে। সেই নৈরাজ্য থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে হুলো, কেলোরাই রাজত্ব করবে। দাপিয়ে বেড়াবে। রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা আর নেই। কী কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিলেন, আর এখন দেখো কী কাণ্ডটাই না করছেন।' ভোট চলাকালে তৃণমূলের নেতারা বারংবার বলেছেন সিপিএম গুণ্ডা নামিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোট করাতো। আমরাও তাই করছি। অবাক করা যুক্তি। সিপিএম ভোট সন্ত্রাস করতো বলেই মানুষ তাদের খারিজ করেছে। ভরসা করেছিল তৃণমূল নেত্রী রাজ্যের মানুষকে স্বচ্ছ প্রশাসন দেবেন। দলদাস মুক্ত প্রশাসন মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। বাস্তবে তা হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী বলছেন আমরা মাইনে দি তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূলের দাসত্ব করবে। মানুষের হাসপাতালে মন্ত্রীর পেয়ারের কুকুরের ডায়ালিসিস হবে। পশু হাসপাতালে নয়। ঘুষকাণ্ডকে ডোনেশন বলে চালানো হচ্ছে। নজির সৃষ্টি করে জেলবন্দি আসামীকে তৃণমূল প্রার্থী করা হয়েছে। আজ তৃণমূলের হাতে বাংলার সংস্কৃতি সম্মান বিপন্ন। এখন আর চুপ করে থাকবেন না। ■

চোরকে চড় মারুন। আইন নিজের হাতে তুলে নিন। তাহলে তো.....

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মাননীয় দিদি,

জানি না এটাই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনাকে শেষ সম্বোধন কিনা। ভোট পর্ব মিটে গিয়েছে। এখন ফলের অপেক্ষায়। তাতে কী হবে কেউ জানে না। কিন্তু শেষ পর্যায়ে আপনি যা বলে গেলেন তাতে খুবই ভয় লাগছে দিদি!

আপনার দলের প্রায় সকলেই চোর হিসেবে অভিযুক্ত। সারদা-নারদ চুরি তো আছেই, সেই সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী অন্যের গবেষণা থেকে চুরি করে পিএইচডি ডিগ্রি পেয়েছেন। দিদি, ক্ষমতা চলে গেলে এদের সবাই যদি চড় মারতে শুরু করে তখন কী হবে?

আপনি বলেছেন, "আমার কোনো অন্যায় হলে আমাকে দু'টো চড় মারুন। কোনো মা-বোন যদি বলেন, আমার বাড়িতে এসে বাসন মেজে দিয়ে যান, তাতেও আমি ভাবব না। কিন্তু চোর বললে আমার গায়ে লাগে।"

এই কথাগুলি যখন বলছেন, তখনও আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আপনি আইন হাতে তুলে নেওয়ার নির্দেশ বা আবেদনই জানিয়েছেন।

অপরাধ ও শাস্তি এক চিরন্তন বিষয়। কোথাও 'শাস্তি'র বিধান থাকলে, কার্যকারণসূত্রে তার 'অপরাধ'-ও থাকবে। তৃণমূলপ্রার্থীদের সমর্থনে সভা করতে গিয়ে আপনি যে মন্তব্য করেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার হলো— তাঁর কোনো অন্যায় থাকলে তাঁকে 'চড়' মারা হোক কিন্তু 'চোর' বললে তাঁর গায়ে লাগে! ঠিকই। তবে চড় যাঁরা মারবেন, তাঁদের পক্ষে তো শাস্তিপ্রাপ্তের অপরাধটি জানা জরুরি!

আসলে যে রাজনৈতিক 'মোডে' আপনি সচরাচর থাকেন, ভোটের শেষবেলায় সেই চেনা ছন্দ থেকে যেন কিঞ্চিৎ দূরে সরে গিয়েছিলেন। যে অপরিসীম কর্তৃত্বের সুরে মঞ্চে ভাষণ দেন, উন্নয়নের উচ্চকিত ঘোষণা করেন, 'পরিবর্তন' জমানার সাফল্যের কথা তুলে ধরেন, দেখা গিয়েছে, সেই রীতিভঙ্গি আপনি বদলে ফেলেন। এই 'নতুন' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও সাক্ষাৎ বিনয়ের অবতার, কখনও মারমুখী। কখনও আপনি ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়ার কথা বলছেন। কখনও আবার জনগণকে বলছেন, তাঁরা ভোট না-দিলে সরকার গড়া যাবে না! বলছেন, চপলতা কিছু ঘটে থাকলে, করিও ক্ষমা! কখনও প্রার্থীকে দেখিয়ে চড় মারতে বলছেন, কখনও আবার বিরোধীদের বুঝে নেওয়ার কথা বলছেন। শুধু তাই নয়, আপনি এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিরোধীনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাসকাসনে অধিষ্ঠিতা থেকেও বিরোধীদের প্রতি 'রিগিং'য়ের অভিযোগ তুলছেন!

অথচ ক'দিন আগেও আপনি বিপুল ভোটে জেতার কথা বলে বেড়িয়েছেন। বাম-কংগ্রেস জোটকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। বাম সম্পর্কে কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস সম্পর্কে বামেদের অতীত মন্তব্যগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সমবেত জনগণকে। এবং 'ব্যর্থ' ও 'নীতিহীন' একটি জোটের দিকে না-ঝুঁকে মানুষ যেন আবার তাঁর দলকেই জিতিয়ে আনেন, সেই মর্মে হুঙ্কার দিয়েছেন। হঠাৎ কি চাকা ঘুরে গেল! আপনার রাজনৈতিক বোধের, দর্শনের সূচিমুখ কি দিক পরিবর্তন করল!

আপনার এই 'পরিবর্তন', এই বিনয়, এই নিবেদন ভঙ্গি রাজনৈতিক ফল লাভের জন্য হয়তো ভাল কিন্তু ভাইদের কথা একবার ভাবলেন না। চোর বলে কেউ যদি চড় মারে তবে কী হবে!

তারপর সেই ভাইয়েরা যদি দিদির দিকে আঙুল তুলতে শুরু করে? ইতিমধ্যেই এক ভাই বলে দিয়েছেন সব চুরি দলের জন্য। এবার কোনো ভাই যদি বলে বসে সব চুরি আসলে দিদির নির্দেশে তখন!

তখন কী হবে! জাস্ট ভাবতে পারছি না। এখন থেকেই দিদি সেই দিনের কথা ভেবে আমি ভয়ে শিউরে উঠছি। দয়া করে দিদি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে দিন— যা বলেছেন সব মুখ ফস্কে বেরিয়ে গিয়েছে।

— **সুন্দর মৌলিক**

কমিউনিজম ও জাতের বজ্জাতি

প্রবাল চক্রবর্তী

কমিউনিজমের তত্ত্বকথা অনেককাল ধরেই পাবলিক আর খাচ্ছে না। দেশে দেশে কমিউনিস্ট বিষবৃক্ষে যেসব উৎকৃষ্ট ফল ধরেছে, তা দেখে কারই বা বিশ্বাস অটুট থাকে? কমিউনিজমে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট হওয়া লোকের সংখ্যা ক্রমশই কমছিল। সেই পরিসর দখল করে নিচ্ছিল ইট-চুন-সুরকির ক্যাডাররা। তাদের জোরেই আরো কিছুকাল 'মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান' হুঙ্কারে গাজোয়ারি করে কাটিয়ে দিল। লোকে ভাবতো, পক্ষীরাজ যদি, তবে ন্যাজ নাই কেন? ভয়ে বলত না। রাজার পার্টি বলে কথা, এমনিতেই হাতে মাথা কাটে। কমিউনিস্টদের শেষ আশ্রয় ছিল এই খণ্ডিত বাংলা। জগদ্দল পাথরের মতো বুকে চেপে বসেছিল বাঙালির শ্বাসরোধ করে। হঠাৎ একদিন 'কোথা হইতে কি হইয়া গেল', দেখি সেখানেও স্থানচ্যুত। লালবাবাদের এখন রিফিউজি দশা। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, বড় দুঃখে কাটে দিন। না হে, বড়ই অবিচার হচ্ছে। ওদের একটা থাকার জায়গা তো চাই? একটা রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ কি কেউ দেবে না?

কলিযুগে লালবাবাদের অন্তিম আশ্রয় ভারতের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসে খোকাবাবুরা পরিকল্পনা করছে, কী করে প্রত্যাবর্তন করবে। ছাত্রছাত্রীদের মাথায় ভর করছে, তাদের চাঁদিতে কাঁঠাল ভেঙে তাদের দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করাচ্ছে। এসব কাজের মধ্যে দিয়েই একদিন ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করবে, এমনটাই স্বপ্ন। কিন্তু মুশকিল ওই, কমিউনিজমের তত্ত্বকথা পাবলিকের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরাও আর খাচ্ছে না। তাই সেই তত্ত্বকথার সঙ্গে কিছু অন্য মালমশলা মেশানো জরুরি হয়ে পড়েছিল। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সেই মশলা মেশানো সম্পূর্ণ হয়েছে। কী নেই সেই ককটেলে! মার্কসবাদ, ম্যাওবাদ, রাক্ষস-খোক্কস-দত্যি-দানো, গুয়েভরা, মহিষাসুর, শূর্পনখা, সাবস্ট্যান্স অ্যাবিউজ, জাতপাত, হাঁচি-কাশি-টিকটিকি, কন্সপিরেসি থিওরি, ইহুদি-বিদ্বেষ, সশস্ত্র জেহাদ, প্যালেস্টাইন, মালদা, খাগড়াগড়— সব আছে। অতি উমদা সে আরক সেবনে অবোধ বালক তুরীয়ানন্দ প্রাপ্ত হয়। নেশার ঝোঁকে নিজের ডাল নিজেই কাটে। যেদিন নেশার ঘোর কাটবে, কেঁদেও কূল পাবে না এইসব ছাত্রছাত্রীরা।

অস্ট্রেলিয়ায় দেখেছি, স্কুলশিক্ষা সরকারি ভরতুকিতে চলে। পাশ করে অধিকাংশই

> **থিওরি যাই কপচাক, আদতে এরা আমাদের মা-কে গালি দিয়েছে। সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। যারা আমাদের মায়ের নামে কলঙ্ক রটাচ্ছে, তাদের যদি আমরা সহ্য করি, তবে ধিক্ আমাদের অস্তিত্বে।**

পেশাগত শিক্ষায় যায়, সেখানেও ভরতুকি মেলে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতুকি ছিটেফোঁটা মাত্র। শুধুমাত্র সিরিয়াস ছাত্রছাত্রীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে। তারা পকেটের কড়ি ফেলে লেখাপড়া করে। খরচ জোগাতে ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে, পার্টটাইম চাকরি করে। দেখেশুনে মনে হয়েছে, ভারতেও এই ব্যবস্থা চালু হওয়া দরকার। গ্যাঁটের পয়সায় লেখাপড়া করলে দায়িত্বজ্ঞান আসবে, ভুলভাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বে না। কিছু সুবিধাভোগী বখাটে ছাত্রছাত্রী গরিব দেশের গরিব জনতার রক্ত-জল-করা টাকা ধ্বংস করে দেশেরই পিঠে ছুরি মারছে। সরকারি স্টাইপেন্ডের টাকা উড়িয়ে ভালো ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের হারামের মধু শুকিয়ে গেলে জব্দ হবে লালবাবারা।

চীনা কমিউনিস্টরা আজকাল কনফুসিয়াসের দর্শন পড়ছে। সেখানকার কমিউনিস্ট চিন্তানায়ক ওয়াং জেই সেমিনার আয়োজন করে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকর্তাদের শেখাচ্ছেন, কনফুসিয়াসের দর্শন কীভাবে সমাজবাদকে সঠিক রাস্তা দেখাতে পারে। চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং-য়ের ভবিষ্যতের চীনের কল্পনার বিরাট অংশই জুড়ে আছে কনফুসিয়াসের দর্শন। এর পাশাপাশি দেশি কমিউনিস্টদের দেখুন। কোনোদিনও গীতা উলটে দেখেছে? মানছি, তারা নিরীশ্বরবাদী, গীতায় তাই অ্যালার্জি। কিন্তু সাংখ্য? জৈন? এগুলো তো নিরীশ্বরবাদী মতবাদ। তবু দেশি লালবাবারা এসবের চর্চা করেনি কোনোদিন। এদের লেখাপড়ার সবটাই পাশ্চাত্য-ঘেঁষা। হেগেল আর মার্কসের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখতো। তবুও, এককালে ওরা লেখাপড়া করত একটু-আধটু। আজকাল সেসবও চুকেবুকে গেছে। নাহলে এরকম উদ্ভট থিওরি খাড়া করে?

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, মানবসমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। হ্যাভস (বড়লোক) ও হ্যাভনটস (গরিব)। এই দুই শ্রেণীর লড়াই বাধাতে হবে। সেই লড়াইয়ে হ্যাভনটসদের পক্ষ নিয়ে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে হবে কমিউনিস্টদের। বাস্তবে দেখা গেল, ব্যাপারটা অতটা সাদাকালো নয়। হ্যাভস আর হ্যাভনটসদের মাঝখানে অসংখ্য মধ্যবর্তী শ্রেণী রয়েছে। রয়েছে ভামাশাহর মতো বড়লোক, যারা দেশের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় গরিব হয়ে যায়। রয়েছে ধাওতাল সাহুর মতো মহাজন, যারা গরিব খাতকদের টাকা ধার দিয়ে ভুলে যায়। উলটোদিকে এমন 'গরিব' মানুষদেরও দেখা মেলে, যারা গরিবেরই রক্ত শুষে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে। কার্ল মার্কস ভেবেছিলেন, মানুষ একটি

আর্থিক জন্তু, অর্থনীতির দাস। আর্থিক পরিস্থিতি ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই তার। বাস্তবে দেখা গেল, আর্থিক পরিস্থিতিই সব পরিচয় নয়। একজন শিক্ষক বা সাহিত্যিক গরিব হয়েও একজন স্বার্থপর বড়লোকের থেকে অনেক বেশি সম্মান পায় সমাজে। ভারতবর্ষে এটা অহরহই ঘটে। মার্কসবাদের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে তাই গোড়ায় গলদ। অনেক চেষ্টা করেও তাই হ্যাভস-হ্যাভনটসের লড়াই বাধানো গেল না ভারতে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বই তো মার্কসবাদের ভিত্তিপ্রস্তর। কী করা যায় তবে? তাই মার্কসবাদের সঙ্গে গাঁজাখুরি আর্য আক্রমণ তত্ত্ব আর বিকৃত জাতপাতপ্রথাকে মিশিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের এক নবরূপ তৈরি হয়েছে। কী সেই নবরূপ? গরিবরা হলো নীচু জাত, তারা অনার্য কৃষ্ণাঙ্গ, এদেশের আদিম নিবাসী। তাদের অসুর, দৈত্য বা দানব বলা হোত এককালে। আর্যরা তাদের খেদিয়ে দিয়েছিল, তাই আজ তাদের নিবাস দক্ষিণ ভারতে। তারা বেদবিরোধী। এদের বিরুদ্ধে আছে বড়লোকেরা। তারা উঁচু জাত, তারাই বহিরাগত আর্য। এদের মূল নিবাস এখন উত্তর ভারত। এরা শ্বেতাঙ্গ, এরা এককালে নিজেদের দেবতা বলত, এরা বেদ মানে। এই উদ্ভট সমীকরণ শুনে বলতে ইচ্ছে করে, আর কইয়েন না কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো। বস্তুত, একটা মজার খেলা হতে পারে— এই থিওরিতে ক'টা স্ববিরোধিতা আছে, সেটা খুঁজে বার করতে হবে। সময় পাঁচ মিনিট। যে বেশি সংখ্যায় স্ববিরোধিতা খুঁজে বার করতে পারবে, জিত তার।

স্ববিরোধিতায় গুলি মারো। পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো। বামজেহাদি ছানাপোনাদের নতুন মন্ত্র 'কাস্ট কনফ্লিক্ট ইজ ক্লাস কনফ্লিক্ট'। জাতিদাঙ্গাই বিপ্লবের সোপান। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। সংগ্রামের সঙ্গী হয়েছে জাতপাতবাদী আর জেহাদিরা। ইচ্ছে, সবাই মিলে ভারতীয় সমাজকে, ভারতবর্ষ দেশটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কমরেড, এলোমেলো না করলে লুটেপুটে নেবেন কেমন করে? লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। লড়াই না থাকলে লড়াই বাধাতে চাই। তাই লাল সেলাম সংগ্রামের সঙ্গী কমরেড দাউদ ইব্রাহিমকে। বিপ্লবী অভিনন্দন কমরেড হাফিজ সইদ আর তাঁর পোষা হুলোদের। লালবাবারা সাতচল্লিশে পাকিস্তানের আজাদি চেয়েছিল। এখন তেনাদের কাশ্মীরের আজাদি চাই। চাইলেই হলো। কাশ্যপ-মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা যদি ওঠে, তবে প্রতিটি কাশ্যপ-গোত্রের নাগরিকের ভোট নিতে হবে। উত্তরাধিকার আইন তো তাই বলে। এই রে! কাশ্মীর উপত্যকার আজকের যারা অধিবাসী, তাদের অধিকাংশই তো তাদের কাশ্যপ-গোত্রের উত্তরাধিকার ভুলে গেছে। তাদের কী হবে? কেউ যদি পিতৃপরিচয় ত্যাগ করে, বাবার সম্পত্তিতে কি তার অধিকার থাকে? তাছাড়া, কাশ্মীর কারোর বাবার সম্পত্তি নয়, দেশমাতৃকার অঙ্গ। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিরও আধিকার নেই দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেবার।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করছি। আগে লালবাবুরা বলত, বাংলাভাষা মাতৃদুগ্ধ। আগমার্কা বাঙালি সেজে হিন্দি-বিরোধিতাই ছিল ওদের প্রধান মোডাস অপারেন্ডি। আজকাল দেখছি, উর্দু-হিন্দি স্লোগানই ওদের বেশি পছন্দ। কেন, টার্গেট অডিয়েন্স বদলে গেছে বুঝি? বাংলা-বাঙালি জিগির তবে কি শুধু লোক-দেখানো ধোঁকার টাটি ছিল? আরেকটা পরিবর্তন দেখছি। আগে লালবাবাদের পেটেন্ট গালাগালি ছিল 'বুর্জোয়া'। এখন সেটা মনুবাদী, আর্যবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী। লেখাপড়া ছেড়ে দিলে এটাই হয়। গালাগালিগুলোও জুৎসই হয় না। মনু তো সুদূর দক্ষিণের কাঞ্চীপুরমে জন্মেছিলেন। তিনি কবে বহিরাগত আর্য হলেন? তিনি আইন-সংহিতাকার। আজ হিন্দুরা আম্বেদকর-সংহিতা মানে, মনু-সংহিতা নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি গুণকর্মের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছি। জন্ম নয়, গুণ ও কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জন্মগত জাতিভেদের বিরুদ্ধে ছিলেন। 'গুণকর্ম'র নিয়ম মানলে ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ায়? আমার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী, এক কাকা ডাক্তার। আমি সরকারি চাকুরে, স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরতা, বোন মাল্টিন্যাশনালে। তার মানে, বাবা বৈশ্য, কাকা বৈদ্য, আমি কায়স্থ, গিন্নি ব্রাহ্মণ, বোন শূদ্র, তাই না? এরমধ্যে কে উঁচু কে নিচু? বাংলায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে অন্ত্যজ বলা হোত। অথচ পালরাজত্বে এঁরাই ছিলেন সর্বক্ষেত্রে আগুয়ান। সেনরাজারা তাঁদের 'চণ্ডাল' আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, পালদের অনুগত কাউকে গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখবে না বলে। আজ যে সমাজপতি, কাল সে অন্ত্যজ— অধিকাংশ 'নিচু জাত'এর পেছনে এরকমই কাহিনি রয়েছে। এটা রাজনীতির দোষ, ধর্মের নয়।

বজ্রযান-সহজযান, চৈতন্যদেব, আউল-বাউল, ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সব মিলেমিশে বাঙালির ব্যবহারিক জীবনে জাতপাতের ভূমিকা হয়েছে অপ্রাসঙ্গিক। প্রেমবিবাহে তো বটেই, আজকাল সম্বন্ধ-বিবাহেও যারা জাতপাত মানে, তাদের পাগল মেনে চাঁদিতে একটা চাঁটি লাগানো কর্তব্য। বাঙালি কিন্তু সেই প্রগতিশীলতা থেকেই এককালে কমিউনিজমে আকৃষ্ট হয়েছিল। কী উল্টো গেরো, আজ কমিউনিস্টরাই বাংলায় জাতিদাঙ্গার চেষ্টা করছে। মৌলালির মোড়ে গিটার বাজিয়ে মহিষাসুরের বদলা চাইছে। আমার এক বন্ধু, জাতে কায়েত, বন্ধুপত্নী নমঃশূদ্র, ইন্ডিয়ায় বেড়াতে যাচ্ছে। বললাম, 'সাবধানে থাকিস। ভুলেও দাম্পত্য কলহ নয়। সেটাকেও না কমরেডরা মনুবাদী আর্য আক্রমণ আর শূর্পনখার ক্লাস স্ট্রাগল বলে চালিয়ে দেয়।' বন্ধুপত্নী রেগে কাঁই, 'আমি শূর্পনখা?' বললাম, 'সখী, তুমি আদ্যাশক্তি মহামায়া। আরেকবার অসুরগুলোকে বেশ করে ঠ্যাঙাও দিকি!'

হেগেল আর মার্কস ছেড়ে দেশি ভামদের এখন আশ্রয় হয়েছে জ্যাকপট ঐতিহাসিকদের ভুয়ো থিওরি। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন নয়, এদের থিওরির ভিত্তি— আর্য বহিরাক্রমণ তত্ত্ব। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো থিওরি বোধহয় এত মিথ্যে আর গোঁজামিলে ভরা নয়, যেরকমটা আর্য বহিরাক্রমণ তত্ত্ব। সে বিষয়ে আরেকদিন কথা বলা যাবে। মজার ব্যাপার হলো, ভুলে ভরা মার্কসবাদ ছেড়ে এখন লালুদারা আশ্রয় নিয়েছে আরো বড়রকমের ভুলে ভরা এক থিওরিতে। এ যেন ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার। এদের যে কী গতি হবে, তা মহাকালই জানেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার। থিওরি এরা যাই কপচাক, আদতে এরা আমাদের মা-কে গালি দিয়েছে। সেটা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। যারা আমাদের মায়ের নামে কলঙ্ক রটাচ্ছে, তাদের যদি আমরা সহ্য করি, তবে নিশ্চিতভাবে আমরা আমাদের মায়ের ব্যাটা নই। ধিক্ তবে আমাদের অস্তিত্বে।

(লেখক প্রবাসী বাঙালি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া)

বিহারেও মদ নিষিদ্ধ
নীতি না শুধুই রাজনীতি?

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

এই নীতিশ সরকারই অতীতে বিহারে মদ ব্যবসাকে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। তাঁর সরকারের আমলেই ২০০৬ সালে বিহার স্টেট রিভারেজেস্ কর্পোরেশন লিমিটেড তৈরি হয় এবং সমস্ত প্রস্তুতকারী সংস্থাকে এর মাধ্যমে মদ বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। তখন থেকে সরকার বেশি সংখ্যায় মদের দোকানকে অনুমোদন দিয়ে আবগারি রাজস্ব বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটের পথেই হাঁটলেন বিহারের নীতিশ সরকার। এতদিন গুজরাট ছিল ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবার তার সঙ্গে বিহারের নামও যুক্ত হলো। নাগাল্যান্ডে যদিও বহুদিন হলো মদ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ তবুও সেখানে সে আইন খুব কমই মানা হয়। এছাড়া নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, কেরল এবং লাক্ষাদ্বীপেও আংশিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

নীতিশ সরকার, প্রাথমিকভাবে, গত পয়লা এপ্রিল থেকে বিহারে দেশি মদ তৈরি ও খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও সরকারি দোকানের মাধ্যমে ভারতে তৈরি বিদেশি মদ ও নামি বিদেশি মদের ব্যবসায় সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী চার দিনের মাথায় আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে সব ধরনের মদের উপরে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার ফলে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলো বলে মনে করা হচ্ছে।

গত বছর ৯ জুলাই, বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে নীতিশ কুমার প্রথমবার মদ নিষিদ্ধ করার পক্ষে সওয়াল করেন। রাজনীতির আঙিনায় নিখুঁতভাবে ঘুঁটি সাজানোর ব্যাপারে নীতিশের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। অথচ নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন দপ্তরের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে অল্পসংখ্যক মহিলার মদ নিষিদ্ধ করার দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আর এখানেই বেশ খটকা লাগছে যে, এই নীতিশ সরকারই অতীতে বিহারে মদ ব্যবসাকে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। তাঁর সরকারের আমলেই ২০০৬ সালে বিহার স্টেট বিভারেজেস্ কর্পোরেশন লিমিটেড তৈরি হয় এবং সমস্ত প্রস্তুতকারী সংস্থাকে এর মাধ্যমে মদ বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়। তখন থেকে সরকার বেশি সংখ্যায় মদের দোকানকে অনুমোদন দিয়ে আবগারি রাজস্ব বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছিল। তাই প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে যে এই সিদ্ধান্ত কতটা নৈতিক কারণে আর কতটা রাজনৈতিক। ২০১০-১১ সালের ভারতের বার্ষিক স্বাস্থ্য প্রতিবেদন থেকে নির্ভরযোগ্য যে সামান্য তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যাচ্ছে ১৫ বছরের উর্ধ্বে মহিলা সমেত বিহারের প্রায় ৯.৫ শতাংশ সাবালকেরা মদাসক্ত, যাদের সংখ্যা ৪৪ লক্ষ! কমজোরি সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে বিরাট সংখ্যক মদ্যপায়ীর উপস্থিতির কারণে সরকার এদের প্রচ্ছন্ন মদত দিয়ে থাকে। ফলে এই প্রবণতা ঠেকানোর সরকারি প্রচেষ্টাও সেখানে অত্যন্ত দুর্বল।

নিষেধাজ্ঞা জারি করার প্রয়াস এ নিয়ে বিহারে দ্বিতীয়বার। প্রথমবার, সমাজবাদী মুখ্যমন্ত্রী, কর্পূরী ঠাকুর, ১৯৭৭-৭৯ সালে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কিন্তু বেশি দামে মদের চোরাকারবার এতটা বেড়ে যায় যে তাঁর উত্তরসূরী রামসুন্দর দাস এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন।

বিহার সরকারের আবগারি রাজস্ব আদায় ২০০৭-০৮ সালে ৫২৫ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৫-১৬ সালে ৪০০১ কোটি টাকা হয়েছে। গত ৮ বছরে ৭ গুণ বৃদ্ধি পাওয়া আবগারি শুল্কই সরকারের রাজস্ব আদায়ের তহবিলে বর্ধিষ্ণুতম অংশ। স্কুলছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণের মতো জনপ্রিয় প্রকল্পে অর্থ সংস্থানের জন্য নীতিশের এই টাকাটার প্রয়োজন ছিল। এতে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটবাক্সও মজবুত হোত— অনেকটা রবিনহুড কায়দার প্রশাসন— মদ্যপ্রেমীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করে জনকল্যাণ প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে গরিবের কাছে সে অর্থ পৌঁছে দেওয়া। বাস্তবিকই, ২০১৫-১৬ সালে রাজ্যের মোট রাজস্বের ১২.৯৫ শতাংশ এসেছে আবগারি শুল্ক থেকে যার মধ্যে দেশি মদ থেকে এসেছে প্রায় ২.১৬ শতাংশ। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে নিষেধাজ্ঞার জেরে বিহার সরকার ৫০২৭ কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের রাজস্ব হারাবে। তবুও নীতিশ এ আঘাতটা নিতে তৈরি। বিরোধী বিজেপি শিবির এটাকে মদ নিয়ে রাজনীতি বলে কটাক্ষ করলেও নীতিশ কুমার কিন্তু বিধানসভায় এই আইন বলবৎ করতে কড়া শাস্তির কথা শুনিয়েছেন। এর সঙ্গে বেআইনি মদ খেয়ে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি বিষমদ খেয়ে পঙ্গু লোকেদের আর্থিক সহায়তা দেবার কথা ঘোষণা করে তিনি তাঁর নতুন আবগারি নীতিতে 'মানবিকতার ছোঁয়া' আছে বলে বর্ণনা করেছেন।

বিহার তার ১০১ বছরের আবগারি নীতি বদলেছে। আইন না মানলে শুধু কড়া সাজাই নয়, বেআইনি শুঁড়িখানার কারণে মৃত্যু ঘটলে মৃত্যুদণ্ডের সাজাও হতে পারে।

কিন্তু একটি কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকলে শুধু আইন করে বেআইনি মদ ব্যবসাকে কতদূর ঠেকানো সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। বিহারের অতীত অভিজ্ঞতা একেবারেই ভালো না। তাই আইনকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করাটা এবার নীতিশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। বিহার পুলিশের উপর অত্যধিক নির্ভরতা সবচেয়ে বড় অসুবিধার কারণ হতে পারে কেননা, এর আগে তারা রোজকার অপরাধ দমনেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যখন বিহারে দেশি মদ তৈরি ও বিক্রিতে বিধিনিষেধ ছিল না তখনও বেআইনি মদের কারবার আর বিষমদে মৃত্যুর ঘটনা আকছার ঘটত। ২০১২ সালেই বিষমদ খেয়ে একসঙ্গে ২৬ জন মারা যায়।

বস্তুত, ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে নেপাল সংলগ্ন গ্রামগুলি বিহারের সংস্কৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সেখানেই ঠিক হয় বিহারে কী ধরনের মদ চলবে বা চলবে না। নেপাল বাদেও বিহারের ৩৮ জেলার মধ্যে ২২টিই উত্তর প্রদেশ, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা লাগোয়া যেখানে মদের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। ১৮০০ কিলোমিটার লম্বা ইন্দো-নেপাল সীমান্ত যেখানে অসংখ্য চোরাপথ আছে যা সামলানো যথেষ্ট কঠিন কাজ। এই সীমানা দিয়ে বৈদ্যুতিন জিনিসপত্র থেকে মাদক, অস্ত্রশস্ত্র, জালনোট এবং হালে সন্ত্রাসবাদীরা— সবই যাতায়াত করে। এই নিষেধাজ্ঞা চোরা কারবারীদের কাছে শাপে বর হয়ে উঠতে পারে। সশস্ত্র সীমা বলের সেনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় বিহার পুলিশ চোরাপথগুলি সিল করে দেবে এটাই আশা করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে, কিছু সংখ্যক পুলিশ ও অসাধু অফিসারদের সঙ্গে চোরাকারবারি আর বেআইনি মদ ব্যবসায়ীদের একটা অশুভ আঁতাতের কারণে সেটা বাস্তবে সম্ভব হয় না। দেশি মদ বন্ধ হয়ে গেলে একটা স্বাস্থ্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে কেননা একটা বড় সংখ্যক মদ্যপায়ী গেঁজানো তালের রস (যদিও এটাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে) অথবা যে সমস্ত মাদক

পানীয়তে সরকারের কড়াকড়ি কম সেসবেও ঝুঁকতে পারে।

রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এর মধ্যে নীতিশের সূক্ষ্ম চাল দেখতে পাচ্ছেন। সর্বোপরি নীতিশের সিদ্ধান্ত তাঁকে একটা জাত-পাত নিরপেক্ষ মহিলা ভোটব্যাঙ্ক তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। নীতিশই বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি মহিলাদের নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বলে বিবেচনা করেছেন। ধারাবাহিকভাবে তিনি বিহারের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছেন এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি ভালো করে জানেন যে তাঁর সিদ্ধান্তে মদপ্রেমীরা ভীষণ চটে যেতে পারে, কিন্তু জাতপাত নির্ভর বিহারে শুধুমাত্র মদ নিষিদ্ধ করার কারণে সম্ভবত খুব বেশি পুরুষ ভোটার তাঁর পার্টির বিরুদ্ধে যাবে না। অন্যদিকে নীতিশ বিরোধীরা কিন্তু এতে বিশুদ্ধ রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন। মহিলাদের এ দাবি দীর্ঘদিনের। তবুও একে কার্যকর করতে মুখ্যমন্ত্রী এত সময় নিলেন কেন? ২০০৫ থেকে একটানা ক্ষমতায় আছেন নীতিশ। তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের উপস্থিতি গত বিধানসভার ভোটের সময় টের পাওয়া গেছে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে কোনোমতে এবার নিজের গড় রক্ষা করেছেন। পরের বার যে তিনি গদি বাঁচাতে পারবেন সে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। বরং সংস্কারের পথে হেঁটে নিজের ভাবমূর্তি বাড়িয়ে রাখাটাই তাঁর কাছে এই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়েছে। এর সঙ্গে তিনি এটাও উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে একই সঙ্গে দেশি মদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিদেশি মদ বিক্রিতে সায় দিলে জনগণের কাছে এই ভুল বার্তাটা পৌঁছতে পারে যে সরকার গরিব বিরোধী। আপাতত তাঁর সামনের লক্ষ্য হলো জাতীয় রাজনীতি আর ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন। এক সময় প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রশ্নে তিনি এনডিএ জোট ছেড়ে দিলেন। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ এখন মোদীজী। তাই আগে থাকতে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি পরোক্ষে নরেন্দ্র মোদীকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বলে মনে হচ্ছে। 'কংগ্রেসমুক্ত ভারত'-এর পাল্টা 'সঙ্ঘমুক্ত ভারত' স্লোগান তুলে একদিকে যেমন নিজেকে তিনি মোদীর প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে মেলে ধরতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি এই ইস্যুতে দুর্বল নেতৃত্বের কংগ্রেসকে তিনি পাশে পেয়ে গেলেন। সব ধরনের জনতা দলকে একছাতার তলায় এনে বৃহৎ জনতা পরিবার তৈরির চেষ্টার পাশাপাশি 'গুজরাট মডেল'-এর মোকাবিলায় তিনি 'বিহার মডেল'কে খাড়া করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এক কথায় তাঁর প্রধান উপদেষ্টা, প্রশান্ত কিশোরকে পাশে নিয়ে এখন সব পদক্ষেপই আগামী লোকসভায় নিজেকে প্রধানমন্ত্রী পদের যোগ্য দাবিদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিচ্ছেন। তা সে নীতির কারণেই হোক বা রাজনীতির কারণে, এই বিলম্বিত বোধোদয়ের জন্য একটা ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য।

সেকালে মদ্যপানের বিরুদ্ধে সচেতনতা

অরূপ নাগচৌধুরী

দু'জন বিখ্যাত মানুষের দু'টি উক্তি দিয়ে বিষয়টা শুরু করব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন— মদ খেয়ো কিন্তু দেখ পা যেন না টলে আর মন যেন না টলে। এবার বলি বাঙালির হিরো আইকন মহানায়ক উত্তমকুমারের একটা স্মরণীয় ডায়লগ— মদ খেলে লিভার খারাপ হতে পারে, চরিত্র খারাপ হয় না! মদ্যপানকে ঘিরে বিতর্ক আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি নীতিশ কুমার বিহারে মদ্যপান নিষিদ্ধ করায় একটা প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসছে— মদ নিষিদ্ধ হচ্ছে কী জন্য? স্বাস্থ্যের কারণে নাকি নীতিগত কারণে? মদ্যপান যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই

রাজনারায়ণ বসু

কেশবচন্দ্র সেন

উত্তর-আধুনিক যুগে নৈতিক কারণে মদ্যপান নিষিদ্ধ? নীতি-পুলিশের দায়ে আপনাকেই না হাজতবাস করতে হয়!

কিন্তু সেকালেও মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে সচেতনতা গড়ে উঠেছিল তার পেছনেও এই দু'টি জিনিস মুখ্য হয়ে উঠেছিল। প্রথমত, স্বাস্থ্যের কারণ তো ছিলই। পাশাপাশি সামাজিক ও নৈতিক দায় থেকেও এই সচেতনতা তৈরি হচ্ছিল। মদ্যপানের ইতিহাস আমার চর্চার বিষয় নয়। কিন্তু এটুকু জানি বৃটিশরা এদেশে আসার পরই এদেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মদ্যপানের হার বেড়ে যায়। কিন্তু বৃটেনের জল-আবহাওয়ায় যে মদ ইংলন্ডীয়দের সহ্য হোত, এখানকার জল-আবহাওয়ায় তা সহ্য হবে কী করে। যার ফলে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই আমরা দেখতে পাই ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের মূলত মদ্যপানজনিত কারণে মৃত্যুমিছিল। উনিশ শতকের চারের দশকের গোড়ায় এ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গড়ে ওঠে ক্যালকাটা টেম্পারেন্স সোসাইটি বা কলিকাতা মদ্য পান মিতাচারী সভা। ১৮৪১ সালের ১০ মার্চ কলকাতার টাউন হলে এক সভায় মদ্যপান-বিরোধী ব্যক্তিরা প্রাথমিকভাবে মিলিত হন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ, রেভারেন্ড ইউনিয়ন চ্যাপেল, আর্কডিকন প্রমুখ। তবে এই সভা নিয়োজিত ছিল মূলত ইউরোপীয়দের মধ্যে মদ্যপান বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে। যদিও এদেশীয়দের জন্য যে একেবারেই কিছু ভাবা হচ্ছিল না তা নয়।

১৮২৭ সালে মাদ্রাজ ও বোম্বে বিভাগের লোকেদের বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানের জন্য পাঁচশো প্রশ্নের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তার মধ্যে মদ্যপান সংক্রান্ত অনুসন্ধানেরও কিছু প্রয়াস ছিল। যেমন— গৃহে অস্বস্তি শুরু হলে পানের অভ্যাস কী পরিমাণে বৃদ্ধি পায়? মত্ততা অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে অপরাধের সংখ্যা তীব্রভাবে কীরূপ বৃদ্ধি পায়? পানাসক্তির জন্য কপর্দকশূন্যতা কীরকম বৃদ্ধি পায়? আবগারি দোকানের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে অপরাধের সংখ্যা বাড়ার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ইত্যাদি। কিন্তু এই পর্যন্তই। এই অনুসন্ধানের উত্তর যে খুব সুখদায়ক হয়েছিল তা নয়, যদিও তা নিয়ে আর বিশেষ নাড়াচাড়া করা হয়নি। এদেশীয় লোকেদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রইল।

কিন্তু পরিস্থিতিটা পাল্টাল উনিশ শতকের ছয়ের দশকে এসে। ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু স্থাপন করলেন সুরাপান নিবারণী সভা। মদ্যপানের বিরুদ্ধে সেই প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন। মদ্যপানের অপকারিতার বিষয়ে রাজনারায়ণ নিজে ছিলেন ভুক্তভোগী। কলেজ জীবনে 'টুপভুজঙ্গ' হয়ে বাড়ি ফিরতেন। এই অপরিমিত মদ্যপানেই তাঁর 'উৎকট পীড়া' হয়েছিল। তাই মদ্যপানের অনিষ্ট হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন তিনি। মদ খাওয়ার পরিমিত-অপরিমিত তত্ত্ব বিশ্বাস করতেন না তিনি। বলতেন পরিমিত মদ্যপান হলো বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা। সেই ছিদ্র ক্রমে বড় হতে হতে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি করে। 'পানদোষের প্রবলতা' কীভাবে যুবসমাজকে পতনোন্মুখ করেছে স্বীয় চক্ষে তা দেখেছিলেন তিনি। মেদিনীপুরে সমাজ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নানান স্বদেশি কাজকর্মেও জড়িয়ে পড়েন রাজনারায়ণ।

আর এক্ষেত্রে যুব-সমাজের চরিত্র গঠন না হলে যে সেই স্বদেশি কাজ সফল হবে না, সেটা ভালো করেই জানতেন তিনি। তাই সুরাপান নিবারণী সভার আশু গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন।

এই সভা স্থাপনের জন্য তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়েছিল। সমকালীন সমাজে সুরাপান নিবারণের প্রচেষ্টার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বুঝিয়ে দেয় নেশা আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় কতটা ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছিল।

একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল ইংরেজি ফার্স্ট বুকের রচয়িতা প্যারীচরণ সরকারের। ১৮৬৩ সালের ১৫ নভেম্বর তিনি স্থাপনা করেছিলেন বঙ্গীয় মাদক নিবারণী সমাজ বা দ্য বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটির। রাজনারায়ণ বসুর সুরাপান বিরোধী সভার প্রভাব মূলত মেদিনীপুর শহরে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্যারীচরণের টেম্পারেন্স সোসাইটি আচ্ছন্ন করল নবজাগরণের কলকাতাকেও। হিতসাধক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'মাদকসেবন আমাদিগের মধ্যে এত সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে যে, উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে, লোকে পাগল মনে করে। এবং যে পুস্তকে মাদক সেবনের বিরুদ্ধে কিছু লেখা থাকে, অত্যল্প লোকে তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছুক হয়।' (বৈশাখ, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)।

এ ধরনের প্রতিবেদনই বুঝিয়ে দেয় সমকালে মদ্যপান সমাজকে কতটা জর্জরিত করেছিল। এবং এও অনস্বীকার্য যে এর পিছনে ইংরেজি শিক্ষার কু-প্রভাবও বিদ্যমান ছিল।

উনিশ শতকের সাতের দশকে কেশবচন্দ্র সেন গড়ে তুললেন মদ্যপান বিরোধী আরেকটি সংস্থা ব্যান্ড অব্ হোপ। স্বামী বিবেকানন্দ এই দলের সদস্য ছিলেন। মদ্যপানের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে তাঁরা বিভিন্ন পুস্তিকাও বিলি করতেন। এইসব আন্দোলনের ফলে সমাজের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ পালটাচ্ছিল। অন্যদিকে মদ্যপানের অভিশাপ যাঁদের ওপর সবচেয়ে বেশি নেমে এসেছে সেই মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারের কারণে রাজনারায়ণ-প্যারীচরণ- কেশবচন্দ্রের উদ্যোগ অনেকাংশে সাফল্য পায়। কিন্তু সার্বিক সাফল্য যে পায়নি তা বর্তমান সমাজ-চিত্রেই মালুম। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

B.M.

চিঠিপত্র

লোকবিনিময় ও ড. আম্বেদকর

গত ১৩ এপ্রিল টাইমস অফ ইন্ডিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করেছে যে ড. আম্বেদকর সংবিধানে ৩৭০ ধারার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ও ইউনিফর্ম কোড বিল-এর সমর্থক ছিলেন। যদিও বাবাসাহেব সংবিধানের প্রণেতা, তবুও নেহরু তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী জম্মু- কাশ্মীরের জন্য ৩৭০ ধারা প্রবর্তন ও মুসলিম পার্সোনাল ল' সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আম্বেদকর দেশবিভাগের সময় লোকবিনিময়ের পক্ষপাতী ছিলেন। ওই সময়ে ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ হলেও ভারতের মোট জমির ২৭ শতাংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। আম্বেদকর তখন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন যে যদি লোকবিনিময় না হয় তবে বিশেষত দলিতরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ একতরফাভাবে পাকিস্তান থেকে অমুসলমানরা চলে আসতে বাধ্য হবে। যার ফলে ভারতে জমির উপর চাপ অত্যধিক বাড়বে ও অর্থব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। তাঁর ওই সময়ের লেখা একটি বই মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশ করেছিল। ওই বইটি থেকে এই তথ্য জানা যায়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে বইটি বাজার থেকে অল্পদিনের মধ্যেই উধাও হয়ে যায়। এখনও কিছু ব্যক্তির কাছে বইটি আছে।

উল্লেখ্য, পুস্তকটি অধ্যয়ন করলে বেশ বোঝা যায় যে, নেহরু ছিলেন একজন ভাববাদী। বাস্তবের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। যার ফলশ্রুতিতে নেহরু নিজেই ভারতের নানা দুর্দশার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে আম্বেদকর ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। তাঁর চিন্তাভাবনা দেশের পক্ষে হিতকর ছিল।

—**অমরনাথ ভট্টাচার্য,**
উদয়রাজপুর, কলকাতা।

'পিছনের দিকে এগিয়ে যান'

কথাটা একটু বেখাপ্পা শোনালেও দু'একটি ক্ষেত্রে প্রায়ই শোনা যায়। শোনা যায় কলকাতায় বাসে চাপলে। ধরুন আপনি হাওড়া থেকে বাসে উঠেছেন, কিছুটা পথ যাবার পর প্রচণ্ড ভিড় হতে শুরু করল। বাসের ওঠানামার জন্য দুটি দরজা। আর আমাদের মতো পাবলিক সবসময়েই চেষ্টা করে সামনের দিকের দরজা দিয়ে উঠতে। এতে পিছনের দিকটা অপেক্ষাকৃত খালি থাকে। তাই প্রথম দরজা দিয়ে যাত্রী উঠলে প্রায়ই কন্ডাক্টর বলে থাকে 'পিছনের দিকে এগিয়ে যান', কথাটা শোনার পর হাসি পেলেও কথাটা কার্যকরী, আর প্রায় প্রত্যেক কন্ডাক্টর এটাই বলতে অভ্যস্ত। এবং এটা বহুদিন ধরে প্রচলিত।

মমতা সরকার একটাও ভালো কিছু করতে পারল না। কোনো উন্নয়নের ধারে কাছে পৌঁছতে পারল না। প্রথমেই মনে পড়ে সিঙ্গুরের কথা। বলুন তো ওইখানে আজ শিল্প হলে কত লোক চাকরি করত, কত অনুসারী শিল্প গড়ে উঠত, কিছুই হলো না। দিদি সকলকে বলতে লাগল টাটার কোনো জিনিস ব্যবহার করবে না। অথচ গোপনে খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রত্যেক নেতামন্ত্রীর রান্নাঘরে টাটার আয়োডাইজড লবণ ছাড়া অন্য কোনো লবণের প্রবেশাধিকার নেই।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সকল শিল্পই চলে যাচ্ছে অন্য প্রদেশে। সেনর‍্যালেকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারল না। জেসপের অবস্থাও সেই প্রকার, ডানলপ এখন ঘুমিয়ে আছে। দুর্গাপুরের অবস্থা করুণ, ম্যাকনিলথেগার ধুঁকছে। অথচ সেদিকে দিদির কোনো হুঁশ নেই। তিনি জনগণের ও সরকারের টাকার শ্রাদ্ধ করে নিজের ভোটবাক্স স্ফীত করতে বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের দানধ্যান ও উন্নতির দিকে ব্যস্ত। অবৈধ মাদ্রাসাকে বৈধতা দিতে সরকারি কোষাগারকে শূন্য করতেও দ্বিধা করেননি। প্রশ্ন হলো তিনি অতো টাকা পেলেন কোথা থেকে? তাঁর উত্তর হলো নিজের আঁকা (অদৃশ্য) ছবি বিক্রি করে। ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা পেয়ে সেই টাকায় দানধ্যান করে চলেছেন। বলাবাহুল্য সেই (অদৃশ্য) ছবি কোথায় গেল? সুদীপ্ত সেনের সারদার অফিসে নেই, তাঁর বাড়িতে নেই, কোথাও পাওয়া গেল না। তাহলে কি ছবিটি পাতিলেবুর রস না সাবানগোলা জলেতে আঁকা হয়েছিল যা কিনা শুকোলেই অদৃশ্য হয়ে যায়?

তিনি যে পেছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তার আর একটা উদাহরণ হলো পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫ অবধি পশ্চিমবঙ্গে ভিখারির সংখ্যা অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক বেশি শুধু নয়, শীর্ষস্থান অধিকার করে বসে আছে।

তাই বাসের সেই কন্ডাক্টারের 'পিছনের দিকে এগিয়ে যান' কথাটির মতো আমাদের দিদির সাধের পশ্চিমবঙ্গ পিছনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং এটাতে পশ্চিমবঙ্গ সবাইকে টপকে গেছে।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী।

সবার প্রিয়
বিল্লদা®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

পশ্চিমবঙ্গ ! নাকি পশ্চিম বাংলাদেশ ?

নবারুণ দে

সুদীর্ঘ ন'দশক প্রতীক্ষার পর ২৭ মে ২০১৪ সালে স্বয়ংসেবক নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবার পরই ডাঃ হেডগেওয়ারের স্বপ্ন বাস্তবায়নে যেন এক ধাপ এগলো এই দেশ। আক্ষরিক অর্থেই যেন হিন্দুত্ববাদের বিজয়ডঙ্কা বাজল। একক ক্ষমতাবান মোদী সরকার তার পূর্বতন স্বয়ংসেবক অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকারের চাইতে অনেক বেশি প্রভাবশালী বলে মনে হলো। কিন্তু এই সরকারের গঠনে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা কি? অবাঙালি-বাঙালি-নেপালি মিলে দুজন মাত্র সাংসদ পাঠালেন, যেখানে গোয়া থেকে দুজন ও জম্মু-কাশ্মীর থেকে পর্যন্ত তিনজন সাংসদ হন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি অঞ্চলের একজনও সাংসদ গেলেন না। কেন? পশ্চিমবঙ্গের গত বিধানসভায় দক্ষিণ বসিরহাট কেন্দ্র থেকে একমাত্র বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য নির্বাচিত হন। অথচ ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে জনসঙ্ঘ, হিন্দু মহাসভা মিলে ১৩টি আসন লাভ করেছিল বিধানসভায়। ১৯৫২-২০১১ এই ছয় দশকে হিন্দু জাত্যভিমান এত তলানিতে ঠেকল কেন? কী তার কারণ? এর অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও গবেষণা জরুরি।

আমার মনে হয় এর নেপথ্যে কতগুলো ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। ১। ১৯৫৪ সালের দুর্ভিক্ষ। ২। ১৯৬৭ সালে সিপিএম-এর উত্থান। ৩। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির আন্দোলন। ৪। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধ ও হিন্দু প্রব্রজন ফলে পশ্চিমবঙ্গে পরিকাঠামোর ওপর চাপ ও অর্থনৈতিক অবনমন। ৫। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে নকশাল দমন ও কেন্দ্র কর্তৃক জরুরি অবস্থা জারি। ৬। ১৯৭৪ সালে গুটি বসন্তের দাপটে হাজার হাজার প্রাণহানি। ৭। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠন। ৮। ১৯৭৯ সালে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে মরিচঝাঁপি, কাশিপুর, কুমিরমারিতে পুলিশ কর্তৃক গোলাবর্ষণ ও উদ্বাস্তু নিধন। প্রায় ৪১২৮টি পরিবার বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ৯। প্রায় সাড়ে তিন দশকের বাম শাসনকালে 'শ্রেণীশত্রু' রূপী হিন্দুত্ববাদীদের প্রতি বিদ্বেষ, হিংসা, বিদ্রুপ, অপপ্রচার, হিন্দুত্বের সম্প্রসারণে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি। ১০। ওই সময়ে বুদ্ধিজীবী নামে ঝোলাওয়ালা এক শ্রেণীর উগ্র বামপন্থীর দাপিয়ে বেড়ানো। ১১। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক লক্ষ লক্ষ হিন্দু নিধন। সেই সব হিন্দু বেঁচে থাকলে আজ পশ্চিমবঙ্গ অথবা বাংলাদেশের রাজনীতিই ভিন্ন খাতে বইত। ১২। বাঙালিদের মাঝে এক অদ্ভুত দ্বিচারিতা বিরাজমান। একাধারে তারা দুর্গাপূজাকে বিশ্ববন্দনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বিশ্বখ্যাত করেছেন অথচ মূল পূজা, চণ্ডী অথবা মহালয়ায় দেবী আরাধনায় উচ্চারিত সংস্কৃত শ্লোকাদি তাদের আক্ষরিক অর্থে প্রভাবিত করেনি। কাশীরাম দাসকে তারা বাঙালির অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেননি, অথচ মহাভারত-রামায়ণ ধারাবাহিক টিভিতে সম্প্রসারণের সময় কলকাতার রাস্তা একসময় জনশূন্য হয়ে পড়ত।

কিন্তু এর আশু সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে। যে রাজ্য থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদাত্ত হিন্দুকণ্ঠ একসময় দিল্লী তথা নেহরুকে কাঁপিয়েছে, যিনি একাই কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিলেন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গবাসী কী করে ভুলে যেতে পারে? এ যেন বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার সময় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল কুড়ি শতাংশেরও কম। আজ পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ২৭ শতাংশ। এটা কী করে সম্ভব? বাংলাদেশে আটক পাকিস্তান কর্তৃক পরিত্যক্ত বিহারি মুসলমানরা কোথায় গেল? তারাই কী কলকাতার রাজাবাজার, মেটিয়াবুরুজ, ধর্মতলায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে? মাত্র ২৪ শতাংশ মুসলমান ভারত ভাগ করে একসময় ২৬ শতাংশ ভূমি হাতিয়ে নিয়ে পাকিস্তান গঠন করে। ২৭ শতাংশ মুসলমান বাংলায় কী ভাবছেন? মুসলিম ধর্মীয় নেতা পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি এবং কারি ফজলুর রহমান বলছেন আমরা (মুসলমান) ২৭ শতাংশ। আমরাই ঠিক করব এখানে কে সরকার গঠন করবে। আত্মঘাতী সংখ্যাগরিষ্ঠ ৭৩ শতাংশ নিশ্চুপ, শতধা বিভক্ত। এরাই সরকার গড়বে। কালিয়াচক, ক্যানিং, দেগঙ্গা করবে। আমরা অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করবো? যে বাংলার মাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ ধ্বনি রচনা করে দেশময় স্বাধীনতাকামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই বাংলার মাটি কানহাইয়া কুমার সীতারাম ইয়েচুরির সতীর্থরা ভাবছেন তাদের ভাবধারায় প্রভাবিত? মিছিলে-সমাবেশে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজ স্কোয়ারে চলছে হিন্দুত্ববাদীদের মুণ্ডপাত। এই জন্যই কি একসময় বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, বাঘাযতীন এ দেশে জন্মেছিলেন? শ্রীচৈতন্যদেবের মাধ্যমে সাধিত হয়েছিল যুগান্তকারী আধ্যাত্মিক পরিবর্তন?

পশ্চিমবঙ্গে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এমন সরকার যারা উপযুক্ত নথি সহযোগে অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করবে। প্রায় আট শতাংশ অনুপ্রবেশকারীর নাম ভোটার সূচি থেকে বাদ দিতে হবে। এতেই খানিকটা ভারসাম্য রক্ষা হবে। আন্তর্জাতিক সীমানা পুরোপুরি সিল করে দিতে হবে। সংখ্যালঘু তোষণ বন্ধ করে দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রকৃত উপায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির উপর জোর দিতে হবে। তবেই পশ্চিমবঙ্গ অন্ধকারের উৎস হতে সরে গিয়ে আলোর দিকে এগোতে পারবে। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গের খুব শীঘ্র অতলে তলিয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। তার সবরকম উপাদান আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। রাষ্ট্রীয়, উন্নয়নমুখী, হিন্দুত্বের পক্ষে একটি সরকারের আজ পশ্চিমবঙ্গে বড়ই প্রয়োজন। জাগো বাঙালি জাগো।

গো-বংশ ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

সুতপা বসাক ভড়

একবার প্রচণ্ড আকাল পড়েছে। জনপদ, গ্রাম সব উজাড় হয়ে গেছে। এই সময় পৃথু রাজা ছোট একদল সৈন্য নিয়ে ফিরছিলেন। সৈনিকেরা খিদে-তৃষ্ণায় কাতর; অথচ কোথাও কোনো খাদ্য নেই। এই সময় রাজা দেখলেন অনতিদূরে একটি গাভী চরছে। বিলম্ব না করে ধনুকে তির সংযোজন করলেন। গাভীটি খাওয়া বন্ধ করে রাজাকে বলল, 'রাজা, তুমি আমাকে কেন মারতে চাইছ?' রাজা বললেন, 'আমি জানি গো-হত্যা মহাপাপ, কিন্তু আমি নিরুপায়, সৈনিকদের জীবন রক্ষা করা হলো আমার ধর্ম; সেজন্য হে গোমাতা, আমি পাপের ভাগী হতে রাজি আছি, কিন্তু রাজধর্ম ত্যাগ করতে আমি অপারগ।" গাভী বলল, "একটু ভেবে দেখ, আমাকে হত্যা করে আমার মাংস তুমি সৈনিকদের দেবে তাদের খিদে মেটাবার জন্য, কিন্তু আগামীকাল আবার তুমি একই সমস্যার সম্মুখীন হবে। তখন কি করবে?" কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজা পৃথু হাত

জোড় করে বললেন, 'আপনি কে?' গাভী বলল, "আমি ধরিত্রী। তুমি আমাকে পালন করো, পরিবর্তে আমি তোমাকে পালন-পোষণ করব। তোমার প্রজাদের কোনোদিন অন্নজলের অভাব হবে না।" রাজা তাই করলেন। তখন থেকে ধরিত্রীর এক নাম হলো পৃথিবী অর্থাৎ কন্যা। পৃথিবীর রক্ষা মানেই প্রকৃতির রক্ষা। আমরা গাভীর দুধ দোহন করি ঠিকই, কিন্তু পুনরায় স্তনদুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। বাছুরের জন্যও কিছুটা দুধ রেখে দেওয়া হয়। 'শোষণ'-এর অর্থ সর্বস্ব চুষে নেওয়া, আর দোহন মানে দোওয়া। সেজন্য গাভীকে আমরা শোষণ নয়, দোহন করি। আমাদের সংস্কৃতিতে শোষণ শব্দের কোনো স্থান নেই।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আজও এদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। যাদের মুখ্য জীবিকা হলো কৃষিকাজ। পারম্পরিক ভাবে এই কৃষিকার্যের সহায়ক হলো গো-বংশ। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখাদের সহায়তায় আঙুলের ওপর গোবর্ধন পর্বত উঠিয়ে সঙ্কেত দিয়েছিলেন যে এই দেশে 'গো' অর্থাৎ গোরুর বর্ধন হলেই সম্পন্নতা আসবে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও গো-বংশের গুরুত্ব একাকার হয়ে গেছে। প্রাচীনকাল থেকেই গোরু হিন্দুদের আস্থা, শ্রদ্ধা এবং আদরের প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। কৃষিপ্রধান দেশ হবার জন্য গোরুকে ভারতীয় জীবনে আর্থিক উন্নতির কারণ বললেও ভুল বলা হবে না। শুধুমাত্র ভারতে নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণকারী এবং রক্ষকের ভূমিকায় গোরুকে আমরা অবহেলা করতে পারি না। রাশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোরোস্লম জোর দিয়ে বলেছেন যে, হাইড্রোজেন বা অ্যাটম বোম প্রয়োগের দুষ্প্রভাব থেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র গোবরের।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের শাসনকাল থেকে সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনকাল পর্যন্ত গোরুর পূর্ণ সংরক্ষণ এবং সংবর্ধন করা হোত। ভারতে মুসলমান আগমনের পর থেকেই গো-মাংসের প্রচলন শুরু হয়। ইংরেজদের শাসনকালে তারা পরিকল্পিতভাবে গোহত্যা এবং গোমাংস খাওয়াকে উৎসাহ দেয়। স্বাধীনতার পর দেশে গোহত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার আশা ছিল, কিন্তু দুঃখের কথা আজও তা পূর্ণ হয়নি। যদিও অনেক রাজ্যেই সরকার আইনত গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু সবসময় তা কার্যকর হয় না। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন হাজার হাজার গোবধ করে সেই গোমাংস বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। ফলস্বরূপ ভারতে গোরুর সংখ্যা কমতে থাকছে। গোরুর সংখ্যা কম হবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃষিব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কৃষক সংকটে পড়ছে। একথা সত্যি যে, ভারতীয় গোরুর ঠিকমতো সংরক্ষণ হলে গ্রামের লোক শহরাভিমুখী হবে না, কৃষকের আত্মহত্যার প্রবণতা কমবে, প্রকৃতির সংরক্ষণ হবে আর লোকেদের রোজগার মিলবে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ দিনে দিনে কমে চলেছে। যেটুকু আছে তাতে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যাপক প্রভাবে উর্বরতা কমেছে; অথচ গোবর এবং জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করে দীর্ঘদিন ধরে দেশের যে জমি উর্বর ছিল, রাসায়নিকের প্রভাবে আমরা কয়েক দশকের মধ্যেই তা অনুর্বর করে দিয়েছি। মাটির উর্বরা শক্তির বৃদ্ধিতে মূল সহায়ক হলো গোবর। গোবর সার প্রয়োগে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভারতের জমি উর্বর রয়েছে। কারণ এর প্রয়োগে মাটির জলধারণ ক্ষমতা ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি হয়।

প্রতি বছর পশুধনের থেকে ৭০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম সাশ্রয় হয়। ৬০০ কোটি টাকার দুধ পাওয়া যায়। ৩০০ কোটি টাকার জৈবিক সার পাওয়া যায়। রান্নার গ্যাস পাওয়া যায় ২০ কোটি টাকার। গো-সম্পদ রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধিতে ঈশ্বরপ্রদত্ত স্রোত— একথা মানতে

এখন অসুবিধা নেই।

গোবর সারে ০.৫-১.৫ শতাংশ নাইট্রোজেন, ০.৫-০.৯ শতাংশ ফসফরাস, ১.২-১.৪ শতাংশ পটাসিয়াম পাওয়া যায়, তাও একে রাসায়নিক সারের থেকে কম করে দেখা হয়। বিজ্ঞাপনের মায়াজালে না ভুলে পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই আসল সত্যটা জানা যাবে। বিদেশি ষড়যন্ত্রে একদিকে রাসায়নিকের বৃদ্ধি, আবার অপরদিকে কৃষিপ্রধান দেশ ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়ার চক্রান্ত কি এখনও বুঝতে বাকি আছে? ১৯৫১ সালে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে গোবংশের অনুপাত ছিল ৪৩০, যা বর্তমানে অর্ধেকের কম হয়ে গেছে।

আমেরিকার কৃষি বিভাগ থেকে প্রকাশিত একটি বইতে বলা হয়েছে 'The Cow is a wondererful Laboratory.' প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ 'বিশ্ববল্লভ'-এর দিশা নির্দেশে লক্ষ্ণৌ রাষ্ট্রীয় বনস্পতি অনুসন্ধান সংস্থান, এবং নাগপুরের গোবিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিকেরা একসঙ্গে গবেষণা করে একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী জৈবিক সার আবিষ্কার করেছেন যাতে গোমূত্র, নীম এবং রসুন মিশ্রিত করা হয়েছে— এটির আমেরিকার পেটেন্টও মিলে গেছে। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে দেখেছেন যে গোবর সারে মাটির উর্বরতা শক্তি তো বাড়েই সঙ্গে সেচের জলের প্রয়োজনীয়তাও কম হয় এবং ফসল নষ্ট করার পোকামাকড়ও হয় না। এসব আলোচনা থেকে বলা যায় যে কৃষিকাজে গোরুর অবহেলা করে আধুনিক যান্ত্রিক কৃষিকাজে অত্যাধিক ক্ষতি হয়ে গেছে।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মানব জীব বিজ্ঞান বিভাগ' গবেষণা করে দেখেছে যে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগের ফলে কৃষকদের ডিএনএ-র গঠন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। রাসায়নিক সারের পরিবর্তে গোবর সারের প্রয়োগ করলে ওইসব কীটনাশকের প্রয়োজনই হোত না। কীটনাশকের বিষ মাটির গভীরে পৌঁছে যায় এবং দীর্ঘদিন ধরে তার কুপ্রভাব থাকে। ফলস্বরূপ, পানীয় জলও বিষাক্ত হয়ে যায়। জল সংশোধন মন্ত্রালয় থেকে জানা গেছে যে প্রায় সব রাজ্যেই কীটনাশক প্রয়োগের ফলে জলে নাইট্রোজেন এবং নাইট্রাইড-এর পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে এবং তা পান করার অযোগ্য হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ওইসব রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক আমদানিতে মোটা অঙ্কের বিদেশিমুদ্রা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এটা কি জেনেশুনে বিষপান হচ্ছে না?

গোবর থেকে বায়োগ্যাস পাওয়া যায়, যা থেকে আলো এবং রান্নার গ্যাস পাওয়া যায়। আই আই টি নতুন দিল্লী একটি পদ্ধতি বিকাশ করেছে, যার দ্বারা বায়োগ্যাসের সাহায্যে সেচের পাম্প, ছোট মেশিন, গাড়ি, স্কুটার ইত্যাদি হালকা বাহন চলতে পারে। একটি সাধারণ গোরুর এক বছরের গোবর থেকে তৈরি মিথেন গ্যাস ২২৫ লিটার পেট্রোলের সমান শক্তি দিতে পারে। Institute of Economic Growth, New Delhi-র মতে দেশের প্রায় আট কোটি বলদ কৃষিকাজে সহায়তা করে। ওই বলদের পরিবর্তে প্রায় দুই কোটি ট্রাক্টরের প্রয়োজন হবে, যার মূল্য প্রায় চার হাজার কোটি এবং সেগুলি চালাবার জন্য লক্ষ লক্ষ লিটার তেল প্রয়োজন হবে। সুতরাং বলদের ঠিকমতো সংরক্ষণ করলে কোটি কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় হবে। গোরু থেকে আমরা দুধ, পনির, মাখন, ঘি, মিষ্টি প্রভৃতি পাই। গোবর এবং গোমূত্র থেকে ফিনাইল, কীটনাশক, সাবান, ধূপ, ওষুধ, তেল ইত্যাদি তৈরি করে গো-পালকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যায়।

দুঃখের হলো, গোরুর এত উপযোগিতা সত্ত্বেও আমরা গোমাংস ভক্ষণকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। শুধু তাই নয় beef party-র হুজুগে এক শ্রেণীর হিন্দুও যোগ দিচ্ছে। তারা কি জানে না যে হিন্দু জীবনপদ্ধতি বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত? গোরুর দুধ খাই সেজন্য গোরু আমাদের কাছে গোমাতা। গোপালক হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এসব ভুলে এ আমরা কী করছি? তবে হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনতে হলে কিছু বলার নেই, কারণ বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।

গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ— এই জেনেই আমরা জীবনযাপন করি। এখন প্রশ্ন হলো কেন নিষিদ্ধ? গোমাংসে কার্বন শৃঙ্খলা সম্পন্ন প্রোটিন থাকে, যা শরীরের গাঁটে গাঁটে জমা হয়ে বাত এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার কারণ হয়। গোমাংস ভক্ষণকারীদের শরীরে prostaglandin নামক হরমোন উৎপন্ন হয়, যা রক্তনালিকাগুলিকে সংকুচিত করে রক্তস্রোত ধীরে করে রক্ত জমিয়ে হৃদয়রোগ এবং পক্ষাঘাতের জন্ম দেয়।

বোবাইন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফেলেপোথিস (বি.এস.ই.) এবং ক্রুটজফেল্ডেট জেকব (সি.জে.ডি.) রোগের মতো মারাত্মক এবং প্রাণঘাতী রোগ গোমাংস ভক্ষণের ফলে হয়। বি.এস.ই. এবং সি.জে.ডি.-র কোনো চিকিৎসা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। এগুলি এইডস্-এর মতোই ঘাতক রোগ।

গোরুগুলি মারার আগে সেগুলি বি.এস.ই. আক্রান্ত কিনা, তা জানার কোনো উপায় নেই, ফলে ওই সংক্রামিত মাংস খেলে মানুষেরাও ওই রোগে আক্রান্ত হবে। গোমাংস একটি প্রাণী জীবাণু COLI-O 157-H-7-কে আশ্রয় দেয় এবং ওই মাংস বিষাক্ত হয়ে যায়। ইটালিতে Mad Cow নামে একটি অসুখের ব্যাপারে জানা গেছে। বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস মানুষের মস্তিষ্কের এই অসুখ, যাকে বোবাইন এমিইলোয়োডোটিক স্পঞ্জীফর্ম এন্সেফেলেপ্যাথি (বি.এ.এস.ই.) বলে, তা গোমাংস ভক্ষণরই ফল। গোমাংস DIOXIN নামে একটি বিষাক্ত জৈব রসায়ন থাকে প্রচুর পরিমাণে। এটি ক্যান্সার, নিরন্তর ক্লান্তি বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ইউনানি চিকিৎসাতেও গো-মাংস ক্ষতিকর এবং বর্জিত খাদ্য হয়েছে, কারণ তা শরীরে প্রচুর রোগ সৃষ্টি করে।

কয়েকবছর আগে লন্ডন থেকে প্রকাশিত Daily Telegraph-এ একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে বৈজ্ঞানিকেরা গোশালাতে গোরু দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছিল— একদল গোরু সাধারণভাবে, অপরদলকে আদরযত্ন করে। বেশ কয়েকদিন পরে দেখা গেল, যে গোরুগুলিকে বেশি আদরযত্ন করা হয়েছিল, তারা অন্য দলের গোরু থেকে বেশি পরিমাণ দুধ দিচ্ছে। পশুকে ভালবাসলে তারাও আপন হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকদের এই প্রয়োগ আমাদের শেখায় আমরা যেন তাদের খাদ্য না বানাই, তাদের ঠিকমতো লালন-পালন করলে তারাও আমাদের পালন করবে কারণ— 'পরোপকারায় দুহন্তি গাবঃ।' ■

শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকর প্রভু অদ্বৈতাচার্য

জনৈক ভক্ত

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরবৃন্দের মধ্যে গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই শ্রেণীর লোকই ছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং এবং রূপ সনাতন প্রথমে গৃহী ও পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রথমে সন্ন্যাসী ও পরে গৃহী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রভু অদ্বৈতাচার্য চিরদিনই গৃহী থেকে গিয়েছিলেন। তিনি কোনোদিন সন্ন্যাসগ্রহণ না করেও বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের শিখা জ্বালিয়ে রেখে ছিলেন।

শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে ৮৪০ বঙ্গাব্দে (১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল কমলাক্ষ। অদ্বৈতাচার্যের জীবন সম্বন্ধে প্রামাণিক চরিত্র গ্রন্থগুলি থেকে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। ১২ বৎসর বয়সে কমলাক্ষ (অদ্বৈতাচার্য) পিতার সহিত শান্তিপুরে আগমন করেন এবং দীর্ঘ সময় শান্তিপুরে অতিবাহিত করেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল সীতাদেবী। অদ্বৈতাচার্যের ছয় পুত্র ছিল। যথাক্রমে অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, স্বরূপ, জগদীশ এবং বলরাম। বলরাম মিশ্রের দশ পুত্রের মধ্যে যষ্ঠ হচ্ছেন মথুরেশ মিশ্র। এই মথুরেশ ছিলেন প্রসিদ্ধ নৈয়ামিক। মধুরেশের তিন পুত্র— রাঘবেন্দ্র, ঘনশ্যাম এবং রামেশ্বর। অদ্বৈতাচার্যের জীবদ্দশাতেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মথুরেশ তাঁর পুত্রদের আলাদা আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আজও এই সমস্ত বংশধরদের বিভিন্ন শাখা— বড় গোস্বামী বাড়ি; মধ্যম গোস্বামী বাড়ি; মদন গোপাল গোস্বামী বাড়ি; পাগলা গোস্বামী বাড়ি; আতা বুনিয়া গোস্বামী বাড়ি এবং বাঁশ বুনিয়া গোস্বামী বাড়ি নামে খ্যাত। অদ্বৈতাচার্যের সাধনাস্থল শান্তিপুরের বাবলায় অবস্থিত। মথুরেশ মিশ্রের অধস্তন পুরুষরা এখনও বিভিন্ন বিগ্রহের সেবা করে থাকেন। অদ্বৈতাচার্যের পুত্র বলরামের বংশেই জন্মেছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

অদ্বৈতাচার্য শুধু সাধক ছিলেন না কবিও ছিলেন। তাঁর একটি প্রামাণ্য পদ পাওয়া যায়—

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর।
দীন-দুঃখিতের বন্ধু মোরে দয়া কর।।

একটি 'তরজা প্রহেলি'— এই পদটি চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।

এইটি অদ্বৈতাচার্য জগদানন্দের মাধ্যমে চৈতন্যদেবের কাছে পুরীতে পাঠিয়ে ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং ১২৫ বৎসর বয়সে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ▮

SIP ! SIP ! SIP !
RECURRING DEPOSIT
Rs. 2000/- PM
SINCE 1995
TOTAL INVESTMENT
Rs. 4.86 LACS
BECOMES Rs. 1.01 Cr.
THIS RETURN IS TAX FREE
DRS INVESTMENT
MOBILE
9830372090 / 9748978406

ইলিশের খুব দাম

বর্ষাকাল মানেই খাবারের মেনুতে ইলিশ ভাজা, ইলিশ ভাপা, ইলিশ পাতুরি আরও কত পদ। জামাইষষ্ঠীতে তো কোনো কথাই নেই, জামাইকে ইলিশ খাওয়াতেই হবে। নইলে বাঙালি শ্বশুরের মান থাকে না। গঙ্গা-পদ্মার ইলিশের খ্যাতি দেশে বিদেশে। কিন্তু তোমরা কি কখনো খেয়াল করেছ ইলিশের এই চিরাচরিত দৃশ্য ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে। বাজারে যাবার সময় বাবাকে ইলিশ আনতে বললেই বাবা বলে ওঠেন ইলিশের খুব দাম! এটা সত্যি বাঙালির প্রিয় ইলিশ মাছ এখন বাঙালির পাতে ওঠা বড় দায়। তোমরা শুনলে অবাক হবে বাংলাদেশ সরকার এবছর তাদের নববর্ষে ভোজের মেনু থেকে ইলিশ বাদ দিয়েছে। কত দিনের ট্র্যাডিশন তাদের, নববর্ষে ভোজে থাকে ইলিশের নানারকম পদ। অথচ এবছর তা বাদ দিতে হলো। কারণ ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এক সময় ইলিশ কেবল বাঙালির খাবার ছিল না, সারা ভারতের লোক ইলিশ খেত। শোনা যায় মোগল সম্রাটদের পদেও থাকতো ইলিশ। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সেই ইলিশ এখান থেকে যেত না, যমুনা থেকেই ধরা হোত। অর্থাৎ ইলিশ তখন যমুনাতেও পাওয়া যেত।

ইলিশ নোনা জলের মাছ। মজার হলো, ডিম পাড়ার সময় হলে তারা সব ঝাঁকে ঝাঁকে নদীর মিষ্টি জলে এসে ডিম দেয়। তারপর আবার নোনা জলে ফিরে যায়। তার মনে ইলিশরা এক সময় ডিম পাড়ার জন্য কত দূর দূর পাড়ি দিত।

সেসব এখন ইতিহাস। যমুনা দূরে থাক ইলিশ এখন ডিম পাড়ার জন্য ত্রিবেণী পর্যন্তও আসে না। যা আসে সেটা খুব সামান্য। ফলে বাজারে আকাশছোঁয়া ইলিশের দাম। বাবাকে ইলিশের কথা বললেই চমকে ওঠেন।

কিন্তু আমরা কি বাবাকে কখনো জিজ্ঞেস করেছি— কেন এতো ইলিশের দাম? কেন ইলিশ পাওয়া যায় না?

তাহলে জেনে রাখ— ইলিশ গভীর জলে সাঁতার কাটতে পছন্দ করে। গভীর জলে ডিম পাড়ে। ইদানীংকালে পলি জমে জমে নদীর সেই গভীরতা কমে গেছে। ফলে ইলিশরা সব গঙ্গা-পদ্মায় না এসে মায়ানমারের দিকে ডিম পাড়তে চলে যাচ্ছে। তাই আমাদের পাতে ইলিশের আকাল।

আর একটি কারণ হলো বেআইনিভাবে ইলিশ ধরা। ইলিশের মরশুমে জেলেরা যে জাল ব্যবহার করে সরকারি মতে সেই জালের একটি মাপ আছে। সেই মাপে ছোট ইলিশ জালে ওঠে না। কিন্তু বেশিরভাগ সময় সরকারি আইন মানা হয় না। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছোট ছোট ফাঁসযুক্ত জালে মাছ ধরা হয়। তাতে ধরা পড়ে খোকা ইলিশ। ফলে ইলিশ বড় হতে পারে না, ইলিশের বংশবৃদ্ধি হয় না।

ইলিশ কমে যাওয়ার আর একটি বড় কারণ হলো জলদূষণ। গঙ্গার দুই পারে প্রচুর কলকারখানা রয়েছে। সেই কারখানার দূষিত পদার্থ সরাসরি নদীতে গিয়ে জলকে দূষিত করে দেয়। এই দূষিত জলে ইলিশ থাকে না, তারা সব সাগরের দিকে পালিয়ে যায়।

এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছো আমরা কেন এই সুস্বাদু ইলিশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমরা নিজেরাই এর কারণ। আমরা নদীতে নোংরা ফেলি, নির্দয় ভাবে খোকা ইলিশ ধরে খেয়ে ফেলি, জলকে দূষিত করি। আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে এই ইলিশ হয়তো পৃথিবী থেকে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন শুধু ইতিহাস বইতে পড়তে হবে বাঙালির অন্যতম প্রিয় ছিল ইলিশ মাছ।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

উত্তরপ্রদেশ

উত্তরপ্রদেশ ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য। উত্তরে উত্তরাখণ্ড ও তিব্বত। পূর্বে বিহার ও ঝাড়খণ্ড। দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। পশ্চিমে রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশ। আয়তন ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৮৬ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৯ হাজার ৮১৩ জন। ভাষা হিন্দী। রাজধানী লখনউ। প্রধান নদী গঙ্গা, যমুনা ও সরযূ। যুমনাতীরে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ ও সরযূতীরে অযোধ্যায় শ্রীরাম জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধের উপদেশস্থলী সারনাথ এই রাজ্য। প্রাচীন নগরী কাশীতে জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ অবস্থিত। এই রাজ্যে ভক্ত কবীর, রবিদাস, সুরদাস, তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেছেন। ধান, ভুট্টা,জোয়ার, ছোলা, আখ, আলু এবং বিভিন্ন তৈলবীজ প্রধান কৃষিদ্রব্য। চিনি, সুতির কাপড়, ভোজ্য তেল, কাগজ, সিমেন্ট ও অ্যালুমিনিয়াম বিভিন্ন কারখানায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সারা রাজ্যে বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত।

প্রশ্নবাণ

১. কোন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংবাদিক পুলিজার পেলেন?

২. মদন পূজা কোন্ জেলায় হয়ে থাকে?

৩. বিবেকানন্দ কন্যাকমারীতে কত দিন ধ্যানমগ্ন ছিলেন?

৪. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে কোথায়?

৫. রামধনু ক'টি রঙের সমাহার?

উত্তর : ১. হরগোবিন্দ খোরানা। ২. পুরুলিয়ায়। ৩. তিন দিন। ৪. বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায়। ৫. সাতটি।

ছবিতে অমিল খোঁজ

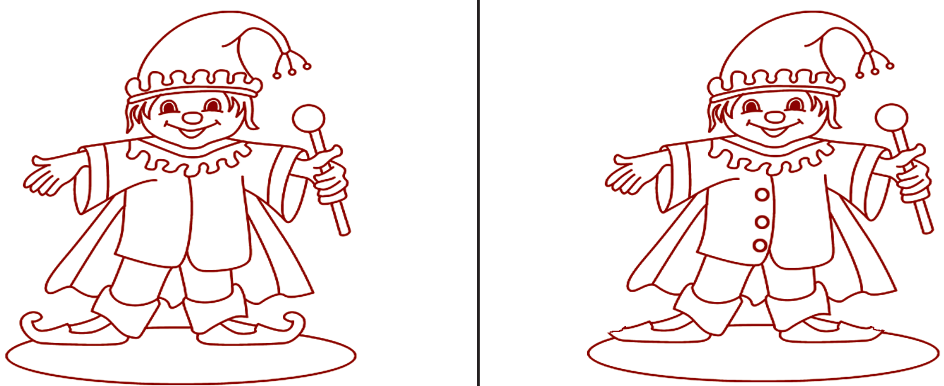

ছোটদের কলমে

পরির মতো মেয়ে

পম্পা সাহা, ষষ্ঠ শ্রেণী, বারাসাত

খাঁ খাঁ রোদে বৃদ্ধ পথিক
ধূ ধূ মাঠের পরে
একলা যাবে মেয়ের বাড়ি
ছাতা মাথায় দিয়ে।
মধ্য মাঠে এসে তার
গলা শুকিয়ে কাঠ

জলপাই কই জলপাই কই
এই বলে দিল হাঁক।
কোথা থেকে পরির মতো
দৌড়ে এলো এক মেয়ে
আদর করে খাইয়ে জল
পালিয়ে গেল ধেয়ে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

এ রাজ্যে সংখ্যালঘু মেয়েরা কি নিরাপদ?

শবরী ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ভারতের সবচেয়ে বড়ো সংখ্যালঘুদরদি হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন। গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির সময়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রয়াস চালিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন করার জন্য কী কী প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, তা-ও এ রাজ্যের অধিবাসীদের সামনে তুলে ধরছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠছে যে, এ রাজ্যে প্রকৃতপক্ষেই সংখ্যালঘুরা ভালো আছেন কি?

গভীর পরিতাপের বিষয় হলো যে, পশ্চিমবঙ্গে মেয়েরা আজ মোটেও সুরক্ষিত নয়। সংখ্যালঘু নারীরাই বা কেন বাদ যাবেন? পার্কস্ট্রিটের সুজেটের কথা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে। তৃণমূলের নেতানেত্রীরা এমনকী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত ওই ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সুজেটের চরিত্র নিয়ে কদর্য প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূলের অনেকেই। প্রধান অপরাধী কাদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। সে সময়ে অপরাধীকে ধরতে কলকাতা পুলিশের 'ধীরে চলো' নীতি ঘোর সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে, কাদেরের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো তৃণমূল নেতা মহম্মদ সোহরাবের কুখ্যাত পুত্র যে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে রেড রোডে বায়ুসেনার এক জওয়ানকে পিষে মেরেছে। কাদেরকে দেশছাড়া হতেও সে সাহায্য করেছিল। সুজেট আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর বিদেহী আত্মা কি জানতে পারবে কোনোদিন যে, ওই পাপিষ্ঠ কাদের তার কৃতকর্মের উপযুক্ত দণ্ড পেয়েছে?

রাণাঘাট কাণ্ডের জেরে ভারতের মুখ পুড়েছে। বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে উঠেছে সমালোচনার ঢেউ। তখন মুখ্যমন্ত্রী আলটপকা মন্তব্য ছুঁড়ে দিলেন, বিজেপি এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। পরে যখন ঘটনার সঙ্গে বাংলাদেশি ডাকাতের যোগ আছে বলে জানা গেল তখন তিনি একটি বারের জন্যও ক্ষমা চাইলেন না তাঁর মন্তব্যের জন্য। যখন জানা গেল প্রধান অপরাধী একজন বাংলাদেশি মুসলমান তখন মা-মাটি-মানুষের সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বললেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। খৃষ্টানরাও কি সংখ্যালঘু নন? অথবা মমতা শুধু ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে কারবার করেন বলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের চেয়ে অনেক কম সংখ্যায় বসবাসকারী খৃষ্টানদের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর চিন্তা নেই?

মুখ্যমন্ত্রী মুসলমান পরবে হিজাব পরেন, ফুরফুরা শরিফে যান— এসব দেখে যে সব মুসলমান ইসলামদরদি ভেবে তাঁকে ভোট দিচ্ছেন তাঁদের জানা উচিত, মুসলমান মেয়েরাও এ রাজ্যে নিরাপদে নেই। সবাই জানেন যে গত বছর জয়নগরে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক তরুণ একটি কলেজ ছাত্রীকে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। ঘটনাচক্রে উভয়েই মুসলমান। ছাত্রীটি গরিব ঘরের। দুঃস্থ বাবা-মা মেয়েটির চিকিৎসা পর্যন্ত ঠিক ভাবে করাতে পারেননি। দশ দিনের মধ্যে তৃণমূলের নেতারা পীড়িত মেয়েটি অথবা তার পরিবারের সঙ্গে একবারও দেখা করার সময় পাননি। মেয়েটি যখন দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারাতে বসেছে তখন সংবাদপত্রে প্রবল সমালোচনা দেখে মেয়েটিকে চিকিৎসার খরচ দেবার কথা তাঁদের মাথায় আসে। অথচ মেয়েটি এখন আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে কি না তার নিশ্চয়তা নেই। তৃণমূলের আগে সুবুদ্ধির উদয় হলে হয়তো তার চোখ দুটি বাঁচত। প্রশ্ন ওঠে, তৃণমূল তথা মমতার মুসলমানদরদ কি পুরোটাই কুম্ভীরাশ্রু অথবা অপরাধী ছেলেটি কোনো তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ?

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর চেয়ে তথাকথিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিয়ে আমাদের সহিষ্ণু ও 'সেকুলার' মুখ্যমন্ত্রী বড়োই ভাবিত। কিন্তু চিন্তার বিষয় একটাই। যেখানে মুসলমানদরদি দিদি তাঁর মুসলমান বোনদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেন না, সেখানে অন্য সংখ্যালঘু বোনদের নিরাপত্তা নিয়ে কে ভাববে? গুজরাট, মধ্যপ্রদেশে কিন্তু এমন হয় না। ■

অতিথি কলম

চেতন ভগত

কাশ্মীরের যুবকদের খোলা চিঠি

তোমরা যদি ভারতকে পছন্দ নাও করো তবুও জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রাখাই তোমাদের পক্ষে সব চেয়ে লাভজনক

হে প্রিয় কাশ্মীরি বন্ধুরা (বিশেষ করে যারা ভারতকে মোটেই ভাল চোখে দেখো না), আমি খোলাখুলি আজ এই চিঠি লিখতে খানিকটা বাধ্যই হচ্ছি, তার কারণ কাশ্মীর উপত্যকার বুকে অতি ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটেই চলেছে। এন আই টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী উপত্যকার পরিস্থিতির বিপজ্জনক অবস্থার সংবাদ সরাসরি জাতীয়স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। ওই প্রতিষ্ঠানের কিছু ছাত্র টি-২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের হারের পর বোমা ফাটিয়ে তাদের উল্লাস প্রকাশ করে। বহু ছাত্র যারা ভারতের জাতীয় পতাকা নিয়ে দেশকে সমর্থন করছিল তারা এদের হাতে বেধড়ক মার খায়। এই খবর চাউর হওয়ার পরই কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়।

একথা অবশ্যই বুঝতে পারছি যে উপত্যকায় ভারতের পক্ষে স্থানীয়দের মনোভাব মোটেই সুখকর নয়। তা ভারতবিরোধীই বলা যায়। বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকা অঞ্চলে সকলে না হলেও বেশ বড় সংখ্যক তরুণরাই পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনই পছন্দ করে। কিন্তু বলে রাখছি, এ বিষয়ে আমি কিন্তু কোনো বিচারকের ভূমিকা পালন করতে চাইছি না। আমি নিজে একজন দেশপ্রেমী ভারতীয় হয়েও কিন্তু তোমাদের ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব বা ঘৃণা পোষণের জন্য কোনোভাবে রেগে যাব না। শুধু এটাই জানা যে তোমাদের এই ঘৃণার পেছনে নিশ্চয়ই নিরেট কিছু যুক্তি আছে।

> ভারত আজ বিশ্বে একটি শক্তিধর অর্থনীতি হিসেবে উঠে আসছে। বাজার অর্থনীতির সে বড় অংশীদার। তুলনায় পাকিস্তানের সত্যি বলতে সেই অর্থে কোনো অর্থনীতিই নেই।

যাই হোক, তোমরা আমাকে আর একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা বিচার করার সুযোগ নিশ্চয় দেবে। প্রথমেই বলছি, আমার যুক্তিতে ভারতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকলেই বাস্তবে তোমাদের সব থেকে বেশি মঙ্গল। ভেতরে ভেতরে বাঁধন আলগা করে আধা বিচ্ছিন্ন থাকার থেকে ভারতের সঙ্গে সংহতি রক্ষা করে কাশ্মীর উপত্যকা ও তোমাদের মিলে মিশে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি কখনই কোনো আবেগতাড়িত বা ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক যুক্তি আমার স্বপক্ষে পেশ করছি না। বরঞ্চ উপত্যকার যে সমস্ত তরুণরা একটি সুস্থ সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে তাদের ভারতের সঙ্গে থাকাটাই যুক্তিগ্রাহ্য।

আমি জানি নানান ক্ষেত্রের বিশারদরা হয়ত এবার আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। হ্যাঁ, সেই সমস্ত ঝানু বিশারদ যারা কাশ্মীর সমস্যাকে একান্তই তাদের অধিগত বলে মনে করে। তাই সমস্যাগুলির যদি সত্যিই সমাধান হয়ে যায় তাহলে এই ঘোলা জলে মাছ ধরা বিশারদরা যাবে কোথায়! ঠিক সেই কারণেই যে কোনো সমাধানের পথ নিদেনপক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগের চেষ্টা হলেও এঁরা রে রে করে নিজস্ব মহাপণ্ডিতের অভিজাত ঘেরাটোপ থেকে চেতাবনী দিয়ে দেন— ‘‘আরে কাশ্মীর সমস্যা একটা জটিল ব্যাপার। এর সমাধান যার তার কাজ নয়।’’ তারা জটিলতা জিইয়ে রাখতে ভালবাসেন। তবেই না সমস্যা সমাধানের জন্য আর একটি বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে যোগ দেওয়া যাবে। কিন্তু তোমরা তরুণরা এই জটিলতার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করতেই থাক, কেননা সমস্যার কোনো সমাধান হয় না।

হ্যাঁ জটিলতা অবশ্যই আছে। সেটা সংক্ষেপে একটু তোমাদের যাদের জানা নেই তাদের বলছি। ভারত যখন স্বাধীন হলো তখন দেশীয় রাজাদের হাতে থাকা রাজ্যগুলি ভারতে লয় (মিশে) হয়ে গেল। জম্মু-কাশ্মীর কিন্তু ভারতে সংযুক্ত হলো না। ঠিক এই সময় পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করে এর অর্ধেকটা নিয়ে নিল (যা তারা এখনও নিজেদের অধিকারে রেখেছে)। এই সময় কাশ্মীরের রাজা ভারতের সাহায্য চাইলেন, পেলেনও।

জম্মু-কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলো কিন্তু কয়েকটি শর্ত রইল, জম্মু-কাশ্মীরের থাকবে নিজস্ব সংবিধান, দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে থাকবে বেশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই রাজ্যের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তার নিয়ন্ত্রণে রাখবে। তত্ত্বগতভাবে এটি বেশ ভাল সমাধান মনে হতে পারে। একটি দেশ দুটি আলাদা প্রণালীর মাধ্যমেই শুধু যা শাসিত হবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরকম হয়নি। উদ্দেশ্য অনুযায়ী দুই পিতার সন্তান হওয়ার হকদার কাশ্মীর কিন্তু বাস্তবে অভিভাবকহীন এক অনাথ হিসেবে পরিচিত হতে লাগল। কাশ্মীর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিল আর একই ধর্মের ধুয়ো তুলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মদত দিতে শুরু করল। ভারতের সেনাবাহিনী এই চাপা সন্ত্রাসকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু যে সন্ত্রাস দেশের নাগরিক সমাজের সঙ্গে একই স্রোতে ভেসে থেকে আধা মদতে বেঁচে থাকে তাকে বাগে আনা যে শক্ত তা সারা বিশ্ব জুড়ে আই এস আই এস-দের দমন করতে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির ব্যর্থতাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ঠিক এই কারণেই বেচারা ভারতীয় সেনারা কাশ্মীর উপত্যকায় বদমাশ-এর তকমা পায় আর শুরু হয় 'We hate India' স্লোগান আর তার থেকে চির সমাধানহীন কাশ্মীর সমস্যা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাশ্মীরি তরুণরা ঠিক কি জানবে? প্রথমেই শুধু কাশ্মীরি নয় অনেকেরই জানা দরকার যে ঠিক কোন অঞ্চল আর কাদের নিয়ে সমস্যা। এ প্রসঙ্গে আমরা জম্মু-কাশ্মীরের যে ম্যাপ দেখতে পরিচিত তার সঙ্গে বাস্তব ভৌগোলিক অবস্থার বিস্তর ফারাক। আমাদের মানচিত্রে প্রদর্শিত অংশ থেকে অর্ধেক চীন আর অর্ধেক পাকিস্তান নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, এই অধিকৃত অঞ্চল আমরা ফেরত নেওয়ার চেষ্টা তো করতেই পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে বহু নিরীহ নাগরিকের বেঘোরে প্রাণ যাবে। তাই আমরা সে চেষ্টা করব না আর তাই ওই অঞ্চলও আর ফেরত পাব না। তাই যা হাতে আছে সেটির দিকেই নজর দেওয়া যাক। এই অঞ্চলকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— (১) লাদাখ, (২) জম্মু এবং (৩) কাশ্মীর উপত্যকা। সমস্যা হলো রক্তক্ষরণের গরিষ্ঠাংশই ঘটে থাকে এই উপত্যকা অঞ্চলেই। অবাক হওয়ার কথা, মানচিত্রে দেখানো অংশের মধ্যে এই সমস্যাকীর্ণ উপত্যকার অংশ মাত্র ৭ শতাংশ যা আয়তনে আমাদের মণিপুর রাজ্যের সমান। (লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ মোটামুটিভাবে যা চেন্নাই শহরের জনসংখ্যার সমান)।

ভৌগোলিকভাবে অঞ্চলটি এবড়ো-খেবড়ো ও চারদিক থেকেই জমি দিয়ে ঘেরা। আচ্ছা এই পরিস্থিতিতে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ভারত একটি ভয়ঙ্কর দেশ এবং তার সঙ্গে কখনই মিলেমিশে থাকা যায় না, সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র কাশ্মীর উপত্যকাবাসীরা কি সত্যিই একটা বিশ্বের মানচিত্রে টিঁকে থাকার মতো দেশ নিজেদের চেষ্টায় তৈরি করতে পারবে। আদতে সে প্রচেষ্টা হলে তা হবে ভারত ও পাকিস্তানের উভয়ের একটি বিবাদ বিন্দু ও শেষ বিচারে মৃগয়া ক্ষেত্র। তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে দেশটির নিজস্ব কোনো অর্থনীতি না থাকায় তাকে নির্ভর করে থাকতে হবে দুই বিরাট প্রতিবেশীর ওপর। পরিণতিতে অঞ্চলটি হয়ে উঠবে সন্ত্রাসবাদী-মাদক ও চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য। শুধু তাই নয়, এইটুকু একটা শক্তিহীন দেশকে মৌলবাদী আই এস আই এস যে-কোনো সময় গ্রাস করে নিতে পারে। আর এটা তো ধরেই নেওয়া যায় যে পৃথিবীর কোনো দেশ থেকেই কেউ এমন একটা জন্মসূত্রে বিপজ্জনক দেশে কোনো অর্থলগ্নী করবে না। তাই সেখানে কখনই কোনো জীবিকাও থাকবে না, থাকবে না কোনো নিরাপত্তাও। আচ্ছা বন্ধুরা, তোমরা কি সেখানে থাকতে চাইবে? ঠিক একই অবস্থা হবে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিলেও। ভারত আজ বিশ্বে একটি শক্তিধর অর্থনীতি হিসেবে উঠে আসছে। বাজার অর্থনীতির সে বড় অংশীদার। তুলনায় পাকিস্তানের সত্যি বলতে সেই অর্থে কোনো অর্থনীতিই নেই।

হ্যাঁ, আর একটি বিষয় হলো নারীদের অধিকার। উপত্যকার জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। মৌলবাদী ইসলামি শক্তির যেরকম রমরমা সেক্ষেত্রে স্বাধীন দেশ হতে চাইলে বা পাকিস্তানে যোগ দিলে সেখানকার মেয়েদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দেখবে জনসংখ্যার এই অর্ধেক অংশ সর্বান্তকরণে ভারতের সঙ্গে থাকলে অনেক ভাল জীবনযাত্রা পাবে। তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি মনে কর মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো দাম নেই তাহলে আলাদা।

তাই বলছি, তোমাদের জনসংখ্যা বেশ কম। তাই ভাবা মোটেই বেঠিক নয় যে তাদের ভারতের সঙ্গে অনায়াসে মেলানো যায়। যার ফলে একটি গোষ্ঠী তৈরী করে, উপত্যকায় ভারত সরকারের উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা যায়। মনে রেখো, তোমাদের স্থানীয় নেতা বা নেত্রীরা কখনই এই মিলমিশ চাইবে না। কারণ তারা শুধু সময়ের পড়ে পাওয়া অন্য যে কোনো ভারতীয় প্রদেশের চেয়ে বাড়তি ক্ষমতা ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই বলছি, তোমরা তরুণরা তোমাদের পক্ষে উপত্যকাকে ভারতলগ্ন করাই সেরা রাস্তা। অবশিষ্ট ভারত ৩৭০ ধারার বিলোপ সেক্ষেত্রে চাইবে না। তোমাদের ৭০ লক্ষ লোক তখন এর বিলোপ চাইবে। যে সমস্ত কাশ্মীরি পণ্ডিতকে তাড়ানো হয়েছিল তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। সন্ত্রাসবাদ, প্রতিশোধ বা ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফে অত্যাচার এই সব নিয়ে পেছন ফিরে থাকলে কোনো সমাধান হবে না। তোমরা নিশ্চয় বুঝেছ সন্ত্রাসবাদ উপত্যকারই সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছে।

তাই এই তথাকথিত সমাধানহীন সমস্যার কিনারা তোমাদেরই করতে হবে। আন্দোলনের মাধ্যমে তোমরা বৈষম্যমূলক ধারা ৩৭০ ধারার বিলোপ চাও। এতে কাশ্মীরের কোনো ক্ষমতা বৃদ্ধি ঘটেনি। ঘটেনি জীবনযাত্রার উন্নয়ন। শুধু ক্ষমতা বেড়েছে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের। আর এরা ভারতের সাহায্য ছাড়া তোমাদের উন্নতির জন্য কিছুই করতে পারবে না।

ভারতীয় সেনাদের দোষ দিও না। তারা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে মিশে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের বেছে বেছে চিহ্নিত করার অমানুষিক কাজ করে চলেছে। এখানে 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ' হওয়ার সম্ভাবনা (নাগরিক যৌথ ক্ষয়ক্ষতি) প্রবল। বরঞ্চ দোষ দাও পাকিস্তানি সেনাদের, স্থানীয় আত্মগর্বী নেতাদের যারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছে আর সেইসব মহাপণ্ডিত বিশারদদের যারা কোনোদিনই সমাধান চায় না। আর ভারত হারলে বোম ফাটিও না। ভারত বেসামাল হয়ে পড়লে আনন্দ পেও না। কারণ ভারত পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তুমিও পড়বে। জয় হিন্দ, জয় কাশ্মীর। ■

অসুরবাবা

সন্দীপ চক্রবর্তী

এখন তিনি এই নামে পুজো পান। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর দিন উত্তরসূরিরা স্মরণ করেন তাঁকে। বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি মহিষাসুর। ভারতীয় সংস্কৃতিতে শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে অশুভের চিরকালীন প্রতিনিধি।

আসল ঘটনাটা যদিও অন্যরকম। হাজার হাজার বছর ধরে প্রচলিত অসুর লোককথা এবং জনশ্রুতি তাই বলে। সেখান থেকে জানা যায় মহিষাসুর ছিলেন প্রজাবৎসল রাজা। যদিও রাজা বলতে যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মহিষাসুর মোটেই সেরকম রাজা ছিলেন না। খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগের কথা। সে সময় গোষ্ঠীপতিদের রাজা বলা হোত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব গোষ্ঠীচিহ্ন অর্থাৎ টোটেম থাকত। মহিষাসুর যে গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন তাদের চিহ্ন ছিল মহিষ। অন্যদিকে দুর্গা যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের গোষ্ঠীচিহ্ন সিংহ হওয়াই স্বাভাবিক।

আরও একটা ব্যাপার মহিষাসুরের রাজকীয় ভাবমূর্তির পরিপন্থী। অন্তত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে। রাজা হলেও মহিষাসুরের একটা পেশা ছিল। তিনি লোহা গলানোর কাজ করতেন। তাঁর গোষ্ঠীরও প্রধান জীবিকা ছিল এটা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা মহিষাসুরের উত্তরপ্রজন্মের কেউ কেউ বলেন বিহারের মালভূমি অঞ্চলে মাটি খুঁড়লে নাকি এখনও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়। যার সবই লোহা দিয়ে তৈরি এবং এতদিন পরেও মরিচার কবল থেকে মুক্ত।

কিন্তু কী এমন হলো যার জন্য দুর্গা আর মহিষাসুরের মধ্যে ওরকম একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বেঁধে গেল। এ প্রশ্নের উত্তরও অসুর লোককথা থেকে পাওয়া যায়। দুর্গা নাকি ছলে বলে কৌশলে রূপের মায়ায় ভুলিয়ে মহিষাসুরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন। উদ্দেশ্য অসুরদের ওপর আর্যদের আধিপত্য বিস্তার। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আর্য আর অসুর তো একই। ভাষাতাত্ত্বিকেরা তার অজস্র প্রমাণ দিয়েছেন। ইতিহাসও

সেই কথাই বলে। কিন্তু মহিষাসুরের উত্তরসূরিরা মানবেন না। তাদের চোখে অসুররা এ দেশের আদি বাসিন্দা। আর্যরা পরে এসেছে। আসার পর সন্ত্রাসবাদীদের মতো অন্যায় যুদ্ধে অসুরদের ধ্বংস করেছে। তাদের পূর্বপুরুষ মহিষাসুরের হত্যাকারীও একজন আর্য নারী। যে নারীকে পরবর্তীকালে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদ মান্যতা দিয়েছে। দেবীর উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, লোককথায় ইতিহাসের উপাদান থাকলেও লোককথা মাত্রই ইতিহাস নয়। এ কথা অনস্বীকার্য সংস্কৃত সাহিত্যে ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রমুখ আর্য দেবতাদের অসুর বলা হয়েছে। আবার রাবণকে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ। মনে রাখতে হবে সে সময় ব্রাহ্মণত্ব ছিল মেধা ও মননশীলতার মাপকাঠি। যে কোনো জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারতেন। জন্মসূত্রে অব্রাহ্মণ বা অনার্য হলেও কোনো বাধা ছিল না। বিশ্বামিত্র এবং বেদব্যাস তার প্রমাণ। প্রথমজন ছিলেন ক্ষত্রিয় আর বেদব্যাস ছিলেন তথাকথিত অনার্য। 'আর্য' শব্দটিকে শুধুমাত্র জাতিবাচক অর্থে গ্রহণ করে আমাদের পাশ্চাত্য-লালিত ইতিহাসবিদেরা প্রথম থেকেই ভুল পথে চালিত হয়েছেন। বস্তুত শব্দটি গুণবাচক। যার অর্থ শ্রেষ্ঠ। আবার 'অসুর' শব্দটির প্রকৃত অর্থ বলবান। সেকাল হোক বা একাল কাউকে যদি শ্রেষ্ঠ হতে হয় তাকে শরীরে মনে বলবান হতেই হবে। অর্থাৎ আর্যত্ব হলো সর্বোচ্চ ধাপ। সেখানে পৌঁছতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আসুরিকতার।

কিন্তু এ তো শুধু ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ। আর্য অনার্য কিংবা এক্ষেত্রে আর্য অসুরদের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটটি বুঝতে হলে আমাদের আরও

একটু বিস্তারে যেতে হবে।

সাম্প্রতিককালে কয়েকজন পুরাতাত্ত্বিক অসুরদেরও আর্য বলেছেন। যদিও দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভাষাগত ও বর্ণগত বেশ কিছু অমিল ছিল। অমিল ছিল বাসস্থান নির্মাণে, নগরভাবনায়, প্রযুক্তিতে, ধর্মচর্চায়।

সংক্ষেপে একবার দেখে নেওয়া যাক সেই মিল-অমিলের পটভূমি। পাঁচ হাজার বছর আগের কথা। তখন ভারতীয় ভূখণ্ডের শুরু আফগানিস্তানের উত্তরে আমুদরিয়া নদী থেকে। সেই নদীর তীরেই দুই গোষ্ঠীর বসবাস। দু'পক্ষই নিজেদের আর্য বলে। কিন্তু একদল কথা বলে প্রাচীন সংস্কৃতে আর অন্য দলের ভাষা প্রাকৃত। একদল ফরসা। চুলের রং অনেকাংশে সোনালি। অন্য দলের গায়ের রং ঈষৎ তামাটে। চুলের রং কালো। ঠোঁট একটু মোটা। আকৃতিও বিশাল। সংস্কৃতে কথা বলা আর্যরা এদের অসুর বলত। তার কারণ অসুরদের শারীরিক শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা। অসুররা তখন আর্যদের থেকে অনেক এগিয়ে। কালক্রমে তারা উত্তর পশ্চিম থেকে এ দেশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এ দেশের আরেক আদি বাসিন্দা দ্রাবিড়রা। আর্যরা যাদের বলত রাক্ষস। হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো কলিবঙ্গাল লোথাল মিলিয়ে এক বিশাল পরিব্যাপ্ত নগরসভ্যতা অসুর আর রাক্ষসদের যুগল অবদান। পরবর্তীকালে আর্যরাও শক্তি অর্জন করে। অসুর আর রাক্ষসদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাঁধে। ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় মোট সাতবার ব্যর্থ চেষ্টার পর রাজা সুদাসের নেতৃত্বে আর্যরা বিপক্ষকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। এইসব যুদ্ধই পুরাণে-ইতিহাসে দেবাসুরের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

দুর্গা আর মহিষাসুরের যুদ্ধকে অবশ্য দেবাসুরের যুদ্ধের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। জোরের সঙ্গে কিছু বলা না গেলেও, হতে পারে যুদ্ধটা নিছকই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই। পশুচারণ ভূমির দখল নিয়ে যে ধরনের লড়াই তখন হামেশাই হোত।

তবে যুদ্ধ যেমনই হোক আর যে কারণেই হোক তা যে মহিষাসুরের উত্তরসূরিদের মনে দগদগে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে সেকথা বলাই বাহুল্য। তারা তাদের আদিপুরুষকে ভোলেননি। দুর্গাপুজোয় তারা অংশগ্রহণ করেন না। সেদিন তারা মহিষাসুর দিবস পালন করেন। স্মরণ করেন প্রিয় অসুরবাবাকে। দূরে ঢাক বাজে। আরতির ঘণ্টা শোনা যায়। কিন্তু তাঁরা ঘরের এককোণে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। নয়তো শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকেন দূরে, মণ্ডপের দিকে।

ধন্য এই দেশ। এই দেশের বিরাট হৃদয়। যে হৃদয়ে শুধু আনন্দ নয়, গর্ব নয়— বহুদিনের প্রায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া যন্ত্রণাও যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়। শুধু পণ্ডিতেরাই সেই নাড়ির সন্ধান পান না।

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

ভারতের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিশু-কিশোরদের মনের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

শিক্ষা মানুষকে সমাজজীবন যাপনের উপযুক্ত করিয়া তোলে। ইহাই শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতে শিক্ষা এই কাজটি করিয়া আসিতেছে। যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তিত হইতেছে; শিক্ষাও পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যটি তেমনই রহিয়াছে। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, শিক্ষার এই মৌলিক উদ্দেশ্যটি যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আজকাল শিক্ষিত লোক আর সামাজিক হইয়া উঠিতেছে না— বড় বেশি স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে। কথায় বলে, বিষ ছাড়া সর্প নাই, স্বার্থ ছাড়া মানুষ নাই। কথাটি সত্য, কিন্তু মানুষের স্বার্থ সমাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেই সীমারেখা লঙ্ঘন করিলেই সমাজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সমাজের সহিত মানুষের এই বোঝাপড়াই মানবমনের বিকাশ সাধন করে; এক কথায় দ্বিপদ-শ্বাপদকে মানবে পরিণত করে। সমাজ-মানব বলিতে সেই মানবকে বুঝায়, যে মানব নিজের মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে। আজ এই মানব বিরল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ শিক্ষার সহিত সমাজের যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলাম। ইংরাজের প্রবর্তিত শিক্ষার কথাই ধরি। আমাদের মনীষীরা বলিয়াছিল ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা কেরানি তৈয়ারীর শিক্ষা। কথাটি মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে সকলেই স্বীকার করি। যাহা-হউক ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ কেরানি হইতেছিল। আর স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ যে কী বস্তু হইতেছে তাহা বুঝা যায় না। কারণ আজও আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য ঠিক করিতে পারি নাই। ইংরাজি শিক্ষাব্যবস্থার ভগ্নাবশেষ লইয়াই চলিয়াছি, সমাজের সহিত যাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। যদি বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশবিরোধী, সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিত না। রাজনৈতিক মতবাদ আমার যাহাই হউক না কেন, মনে রাখিতে হইবে তাহা যেন সমাজবিরোধী, দেশবিরোধী না হয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে লক্ষ্যহীনতার দিকে, সমাজ-বিরোধিতার দিকে দেশদ্রোহিতার দিকে লইয়া যাইতেছে। বহু পূর্বেই এক কবি সে কথা বলিয়াছেন— 'ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানি ইস্কুলে।' আজ মনে হয়, সত্যই কবি ক্রান্তদর্শী। তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। আজিকার ইস্কুলে-ইস্কুলে যে শিক্ষাদান চলিতেছে তাহা সত্যই ছিন্নমস্তা—নিজের মস্তক নিজেই কাটিতেছে। আপনার রক্ত আপনি পান করিতেছে।

প্রথমেই বলি, আজিকার শিক্ষা লক্ষ্যভ্রষ্ট। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই; কোনো উদ্দেশ্য নাই। কেন আমি শিক্ষা গ্রহণ করিব, তাহার কোনো সদুত্তর নাই। শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কী হইবে তাহা শিক্ষকও বলিতে পারেন না। ইংরাজ বলিয়াছেন, কেরানি হইবে। বর্তমান শিক্ষা তাহাও বলিতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির নাই বলিয়া শিক্ষিতেরও লক্ষ্যস্থির নাই। শিক্ষিত ব্যক্তির আচার-আচরণ দেখিলে মনে হয়, ইহারা মনুষ্যেতর কোনো জীব হইবে।

এবার বলি, পাঠ্যপুস্তকের কথা। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকের অবস্থাও তদ্রূপ। বর্তমানে যে সকল পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলির অদম্য জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর সেখানে পাইবেন না। এই সকল অপাঠ্য পাঠ্যপুস্তক শিশু মনকে বিকশিত করে না; আরও সংকুচিত করে, নিরাশ করে। শিক্ষার আনন্দকে মাটি করিয়া দেয়।

বিষয়টিকে আরও ঘনসন্নিবদ্ধ করিয়া বলি। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক একটু মন দিয়া দেখিবেন। কোথাও কিছু শিখিবার নাই। শিক্ষার নামে ইনফরমেশনের জঙ্গলে তাহাকে ঢুকাইয়া দিয়া আমরা মজা দেখি। বেচারা সেই জঙ্গলে টিচার- প্যারা-টিচার, পার্টটাইম টিচার, প্রাইভেট-টিউটর প্রভৃতি শ্বাপদ- আপদের পাল্লায় পড়িয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া কোনোরকমে পড়ি-মরি করিয়া বাহির হইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। শিক্ষা সম্পর্কে তাহার তখন হদ্দমদ্দ জ্ঞান হইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে ভাবে 'ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়।' বাংলা, ইংরাজি, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস যে-কোনো বিষয়ের যে-কোনো ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক দেখুন, কোনো পুস্তকে শিখিবার কিছু নাই। শুধু তাহাই নহে, পুস্তকের মধ্যে যাহা আছে, তাহা শিক্ষার্থীর শিক্ষার আগ্রহে জল ঢালিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। আজি হইতে দশ বৎসর পূর্বের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এমন নির্বিকল্প সমাধির সোপান ছিল না।

মাতৃভাষার কথা বলি। পূর্বের প্রগতিশীল সরকার তো 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' বলিয়া ছাত্রছাত্রীদের আমৃত্যু মাতৃদুগ্ধ পান করাইয়া গেল। ফলে শিশু চিরকাল শিশু হইয়া রহিল। আর তাহাকে কোলে নাচাইয়া, লাল-লালিপপের লোভ দেখাইয়া দেশের দুধ-সর-ছানা-মাখন যেটুকু ছিল নেতারা সাবাড় করিয়া দিল। সর্বহারা সর্বহারাই রহিয়া গেল। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ। ইহার স্লোগান হইল— 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আমরা খাবো, তোমরা বাদ।' আমরা নেতা, আমাদের ছেলেরা ধাত্রীদুগ্ধ (ইংরাজী) পান করিবে; তোমাদের ছেলেমেয়েরা মাতৃদুগ্ধ (বাংলা) পান করিবে। এইভাবে তাহারা মাতৃভাষা শিক্ষার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িল।

তাহার পর কত মায়ের কোল শূন্য করিয়া দিয়া, কত এয়োতীর সিঁদূর মুছাইয়া

পরিবর্তনের সরকার আসিল। তাহারাও একই পথে চলিল। শুধু চলার কায়দাটি ভিন্ন। তাহারা সর্বহারাকে সর্বহারাই করিয়াছিল। কারণ বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদ ইহার বেশি কিছু করিতে পারে নাই। আর পরিবর্তিত সরকার মা ও মানুষকে মাটি করিয়া দিল। তাহার সহস্র নমুনা আজিকার বাঙলা স্কুলপাঠ্য পুস্তকের পাতায় পাতায় পাইবেন। এই পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া মাতৃভাষা শিক্ষার সপিণ্ডীকরণ হইতেছে। একটিও গদ্য, একটিও পদ্য পড়িয়া শিক্ষার্থী শিশু আনন্দ পায় না। কাব্য-কবিতা-সাহিত্য, পাঠকের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়; বাজিয়া ওঠে। তবেই তাহা হৃদয়কে নাড়া দেয়। সেই ধাক্কায় হৃদয় জাগিয়া ওঠে— দানব মানবে পরিণত হয়; মানব দেবত্বে উন্নীত হয়। আজিকার সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখিবেন। সাহিত্য পাঠের আনন্দ কর্পূরের ন্যায় নিমেষে উবিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষাও ভুলিবে।

এবার বলি ইংরাজির কথা। আজিকার ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখিলে ভীতি জন্মায়। সেগুলি যেন শিশুকে গিলিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আছে। বাঙালির ছেলে যাহাতে ইংরাজি শিখিতে না পারে, কেবল মাতৃদুগ্ধ খাইয়া কোনোরকমে টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পাঠ্যপুস্তক পড়িলে আর যাহাই হউক কেহ ইংরাজি শিখিবে না। তাই দেখা যায়, আমাদের ছেলেমেয়েরা যত লেখাপড়া শিখিতেছে ততই বাংলা ভুলিতেছে, কিন্তু ইংরাজি শিখিতেছে না। ফলে কোনো ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

আমরা জানি, বিদেশি ভাষা শিখিবার পদ্ধতি হইল অনুবাদ পদ্ধতি। অর্থাৎ আপন মাতৃভাষা হইতে বিদেশি ভাষায় অনুবাদ করা এবং সেই বিদেশি ভাষা হইতে আপন মাতৃভাষায় অনুবাদ করা। এখনকার পণ্ডিতরা বলিতেছেন, ইংরাজি বিদেশি ভাষা নহে; দুইশত বৎসরে আমরা তাহাকে মাতৃভাষা করিয়া তুলিয়াছি। অতএব ইংরাজিতে স্বপ্ন দেখিতে হইবে, তবেই ইংরাজি শেখা যাইবে। তাই বাপকে 'পাপা' বলিতে হইবে, মাকে 'মাম্মি' বলিতে হইবে। তবেই ইংরাজি শেখা যাইবে। ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকগুলিতে শুধু ইংরাজিয়ানার হিসাব- কিতাব; ইংরাজির কিছু নাই। আর ব্যাকরণ শিক্ষা! উহার কোনো প্রয়োজন নাই। কী বাংলা কী ইংরাজি আমি যাহা বলিব তাহাই ঠিক। কারণ আমি নির্বাচিত প্রধান। সুতরাং সরণী ও ধরণীর কোনো প্রভেদ নাই। যাহা সরণী তাহাই ধরণী। এই ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থায় মা-মানুষ-মাটি হইয়া গেল। প্রসঙ্গত আর একটি কথা; আজকাল বানানের মা-বাপ নাই। সেগুলি অনাথ হইয়া গিয়াছে। যেমন বাংলায়, তেমন ইংরাজিতে। যাহা হউক একটি লিখিয়া দিলেই হইল। যাহা হউক একটি অর্থ-অনর্থ প্রকাশ করিলেই হইল।

এবার বলি গণিতের কথা। গণিতের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে গণিত অপেক্ষা গল্প বেশি। যেন গল্পের মাধ্যমে গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যোগ-বিয়োগ-গুণ- ভাগ-ভগ্নাংশ- ল.সা.গু., গ.সা.গু. প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য যে পদ্ধতি, যেসব গল্প প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে শিশুমন ওই গল্পেই নিবদ্ধ থাকিবে, গণিতে নহে। আবার গল্পের কুশীলবগুলি আনুপাতিক হারে সংখ্যালঘু হইতে হইবে কারণ তাহাদেরও ভোট আছে। গণিতের পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখিলে বড় অদ্ভুত লাগে। বইগুলির অধিকাংশই গল্প, যাহা পড়িতে পড়িতে শিশু মন ক্লান্ত হইয়া যায়; গণিতের প্রতি আর কোনো আগ্রহ থাকে না। তদুপরি বইগুলি আবার ছেলেভুলানো ছড়ার বইয়ের ন্যায় রঙ-বেরঙের ছবিযুক্ত। ফলে শিশুমনের একাগ্রতা নষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের গ্রামের স্কুলের গণিতের শিক্ষক মহাশয় কেশব নাগ মহাশয়ের গণিত বইয়ের সাহায্যে ক্লাসে অঙ্ক কষান। জানি না, তাঁহার চাকুরি কতদিন থাকিবে!

বিজ্ঞান-ভূগোল-ইতিহাস সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি একরকম। শিক্ষার্থীর কোনো জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না। সর্বোপরি শিক্ষার্থীর মনে কোনো জিজ্ঞাসা তৈয়ারি করিতে পারে না। এই বিষয়গুলির সহিত পরিবেশ নামক একটি মশলা মিশাইয়া কী যে একটি ব্রহ্ম-খিচুড়ি করা হইয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠাই কঠিন। শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ যাহাতে সৃষ্টি না হয়; তাহার সুব্যবস্থা পাঠ্যপুস্তকগুলিতে করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় ভূগোল-বিজ্ঞান-ইতিহাস কোনো বিষয় পড়িবার প্রতি কোনো ছাত্রের আগ্রহ নাই। বাংলা-ইংরাজি-গণিত তো আছেই। বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর এই উদাসীনতা, এই অনাগ্রহ, শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এখনকার শিশুরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তাহাদের রঙ-বেরঙের ছেলে-ভুলানো ছড়ার বইয়ের ন্যায় পাঠ্যপুস্তক দিয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা বৃথা। শিক্ষার্থী শিখিতে চায়; জানিতে চায়। ইহাই তাহার সহজাত প্রবৃত্তি। শিক্ষার নামে আমরা তাহার এই প্রবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দিতেছি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ইহাই বৈশিষ্ট্য। আজ বাংলায় এমন শিক্ষক বিরল, যিনি বলিতে পারিবেন কি তাঁহার শিক্ষকতার জীবনে কয়টি ছাত্র তাঁহাকে শ্রেণীকক্ষে পাঠ্য বিষয়ের উপর প্রশ্ন করিয়া কিছু জানিতে চাহিয়াছে? অথচ তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন শ্রেণীকক্ষে তাঁহার শিক্ষককে কত না প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অদম্য কৌতূহল নিবৃত্তির আধার ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমার প্রশ্ন এইখানেই। ছাত্রের সেই জিজ্ঞাসা কোথায় গেল? কেন ছাত্রেরা ক্লাসে কিংবা ক্লাসের বাইরে শিক্ষককে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না? তবে কি লেখাপড়া করিতে তাহাদের ভালো লাগে না? কেন ভালো লাগে না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়া আমার অভিজ্ঞতা হইল— শিক্ষার ফলপ্রসূতা। বহু ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের বলিতে শুনি--- 'স্যার লেখাপড়া শিখে কী হবে, চাকরি-বাকরি তো আর হবে না।' কোনো প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে পথে-ঘাটে দেখা হইলে কুশল জিজ্ঞাসার পর 'তুমি কী করছো?' এই প্রশ্নটি করিতে ভরসা হয় না। কারণ তাহার উত্তর বড় করুণ— বেকার, কিংবা ছদ্মবেকার। মনে হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য কী এই— একটা চাকরি! শিক্ষার উদ্দেশ্য যে কী, তাহা আমরা আজও সমাজের সামনে উপস্থাপিত করিতে পারিলাম না। কত ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে বিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া যায়— কোথায় যায়? কেন যায়? ইহার উত্তর খুঁজিলে দেখিবেন, এই বিদ্যালয়-শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহার ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথের ফটিক, কিংবা তারাপদ আজ আমাদের ঘরে ঘরে রহিয়াছে। শিক্ষার প্রতি, শিক্ষালয়ের প্রতি, সর্বোপরি জীবনের প্রতি আজকালকার শিশুদের, কিশোরদের অনীহা যেন ক্রমশই বাড়িতেছে। ইহার একমাত্র কারণ শিক্ষাব্যবস্থা তাহার মনের চাহিদা পূরণ করিতে পারিতেছে না। শিক্ষক তাহার জীবনের দিশা নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিতেছেন না। সমাজ তাহাকে স্নেহময় আচ্ছাদন দিতে পারিতেছে না। বস্তুবাদী, ভোগবাদী সভ্যতার ইহাই চরম পরিণতি। এই সমস্যা বিশ্বজনীন। ■

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এ দৃশ্য সিনেমায় আমরা অনেকবার দেখেছি। সেনাবাহিনীর শিক্ষিত স্নিফার ডগ শত্রু শিবিরে ঢুকে কীভাবে সেনাগোয়েন্দাদের তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ে সহায়তা করছে। প্রয়োজনে বিপক্ষের কালাশনিকভ-ইনস্যাসের সামনে দাঁড়াতেও পিছপা হচ্ছে না।

সিনেমার ঘটনা যে বাস্তবেও ঘটে তার প্রমাণ রকি। তার পরিচয় সে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এন এস জি)-এর গোয়েন্দা-কুকুর। পাঠানকোটে তার অদম্য সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে সারা দেশ তার জন্য গর্বিত। সে গর্বের গভীরতা এমনই যে আর কিছুদিনের মধ্যে রকি সরকারি পুরস্কার পেতে চলেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে রকির অকুতোভয় মানসিকতার জন্য তাকে সেনাপদক দিয়ে সম্মানিত করবার নির্দেশ দিয়েছে।

পাঠানকোটের সারমেয় নায়ক

যদিও অর্থ দিয়ে রকির অবদান মাপা উচিত নয়। তবুও পুরস্কারের অর্থমূল্য নেহাত ফ্যালনা নয়। পুরস্কার পেলে রকি দশ বছরের কর্মজীবন শেষ করে কুড়ি হাজার টাকার মাসিক পেনশন পাবে। সাধারণত পুলিশ বা সেনাবাহিনীর কুকুরদের বিধিবদ্ধ সার্ভিসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। রকির ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। সে শুধু পেনশনই পাবে না, তার দেখাশোনার জন্য সর্বক্ষণের একজন কর্মীও নিয়োগ করা হবে।

কেমন কুকুর রকি? সে যেমন ভয়ঙ্কর তেমন ধূর্ত আর ঠিক তেমনই সজাগ। যার প্রমাণ পাওয়া গেছে এ বছরের শুরুতে পাঠানকোটে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জইশ-ই-মহম্মদের দু'জন সন্ত্রাসবাদী পাঠানকোটের বায়ুসেনার ঘাঁটি আক্রমণ করে সেখানকার দখল নেয় এবং প্রতি আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ঘাঁটিতেই আত্মগোপন করে। স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এন এস জি)-র কম্যান্ডোরা কোনো ঝুঁকি নেননি। গোটা ঘাঁটিটাই উড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর আসরে নামে রকি। এক সেনা আধিকারিক, যিনি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি জানিয়েছেন, রকিকে যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখনও ঘাঁটি দাউদাউ আগুনে জ্বলছে। চরিদিকে ধোঁয়া রকি বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায়নি। ঘাঁটির চারপাশে প্রায় আধঘণ্টা চক্কর কেটে সে সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেনেডপিন রাখার ব্যাগটির সন্ধান পেয়ে যায়। মহা মূল্যবান আবিষ্কার সন্দেহ নেই। কারণ পিন ছাড়া গ্রেনেড অচল। ওখানেই শেষ হয়ে যায় সন্ত্রাসবাদীদের জারিজুরি।

ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, কতকটা রকির জন্যেই কম্যান্ডোদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘাঁটিতে প্রবেশ করার প্রয়োজন হয়নি। এর ফলে কম্যান্ডোদের প্রাণহানি এড়ানো গেছে। সন্ত্রাসবাদীদের কব্জা করতেও বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। রকি অবশ্য মারাত্মক আহত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের জমিয়ে রাখা বিস্ফোরকে আগুন লেগে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় তাতেই রকির সর্বাঙ্গ ঝলসে যায়। আপাতত সে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে সে।

পাঠানকোটে রকির অবদানকে সেনা ও সরকার কতটা গুরুত্ব দিয়েছে তার প্রমাণও দিয়েছেন ওই আধিকারিক। এই অভিযানে যে সাতজন নিরাপত্তা রক্ষী ঘাঁটির দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই শহীদ হয়েছেন। তাদের মধ্যে একমাত্র জগদীশ চাঁদকে মরণোত্তর কীর্তিচক্র সম্মানে ভূষিত করেছে সরকার। এমনকী বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের প্রধান ই.কে

নিরঞ্জনের নামও পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয়নি। বলা হয় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াই হলো মানবিকতা প্রতিষ্ঠার লড়াই। অথচ আমাদের এই পৃথিবী মানুষ এবং মনুষ্যেতর সকলের পৃথিবী। তাই রকির অবদান সামান্য একটা কুকুরের প্রভুভক্তি মনে করে উপেক্ষা করা হয়নি— বরং তাকে সম্মান জানানো হয়েছে, এর জন্য সরকার এবং সেনা উভয়েরই প্রশংসা প্রাপ্য।

রকি যে সেনাবাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু তার শিক্ষার বহর দেখলে তাক লেগে যায়। লুকানো শিকার ধরতে সে ওস্তাদ। সেই শিকার যে হোক আর যাই হোক। সেই সঙ্গে লুকিয়ে রাখা বিস্ফোরকের সন্ধান দিতেও তার জুড়ি মেলা ভার। তবে সব থেকে বিস্ময়কর বোধহয় তার ভাব বিনিময়ের ভঙ্গীটি। রকি কুকুর হলেও ডাকে না! বস্তুত টু শব্দটি পর্যন্ত করে না। শুধু একটি বিশেষ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। সেই মাথা নাড়া দেখে তার প্রশিক্ষক থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীর কর্তারা পর্যন্ত বুঝে যান সে কী বলতে চায়! রকি বেলজিয়ান ম্যালিওনিস প্রজাতির কুকুর। এই প্রজাতির এটাই বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিক ভাবেই সেনাবাহিনীতে ম্যালিওনিসদের বিরাট চাহিদা। কারণ ডাকে না বলেই শত্রুপক্ষ এদের গতিবিধি আগাম বুঝতে পারে না। বাহিনীর তাতে সুবিধে হয়। এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর কাছে বারোটি এই প্রজাতির কুকুর আছে। এদের ঘ্রাণশক্তি মানুষের থেকে চল্লিশগুণ বেশি। এরা একটানা পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটতে পারে। এত গুণ জার্মান শেফার্ড বা ল্যাব্রেডরদেরও থাকে না।

সত্যিই রকি অতুলনীয়। প্রকৃতি যত প্রাণী সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে মানুষ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। আর কুকুর বোধহয় সব থেকে বিস্ময়কর। নিজের পশুধর্ম বজায় রেখে এমন মানবিক হয়ে ওঠা সহজ কাজ নয়। তাই তো রকির নাম ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়। তার আরোগ্য কামনায় গোটা দেশ উদ্বেল হয়ে ওঠে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

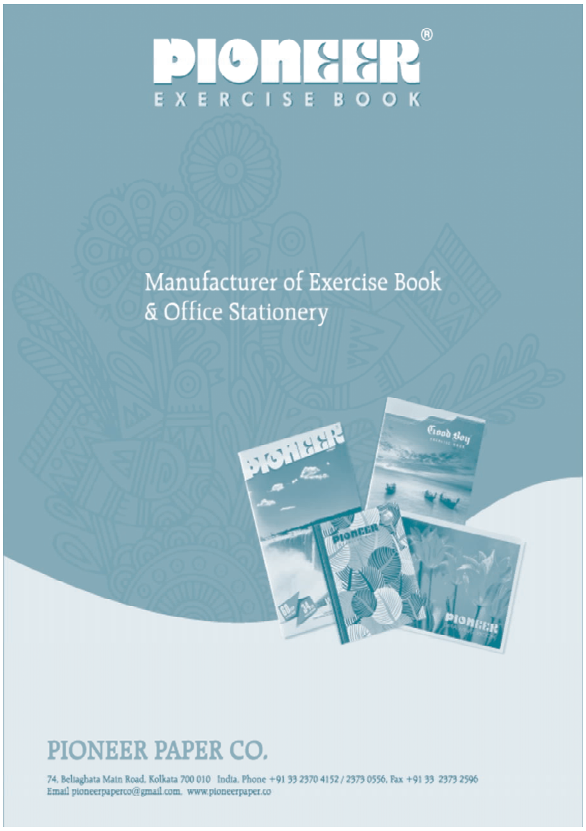

‘অন্তত দু’জন ব্যক্তি যথার্থ সাহসিকতার সঙ্গে শিল্প বিষয়ে অধ্যয়ন করুক— তারা ভারতের সমগ্র শিল্পজগতে আনবে পরিবর্তন। অন্তত একটি শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাদের সমস্যা সম্যকরূপে অনুধাবন করুক, আর তখনই জন্ম নেবে নূতন শিল্প। কারণ জীবন হতেই জীবনের স্ফূর্তি ঘটে। কিন্তু গভীর প্রেরণা ভিন্ন জীবনের পরিবর্তে হবে শিল্পের অপমৃত্যু।’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

মানব শরীরে গাজরের উপকারিতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আমাদের প্রত্যেকদিনের জীবনে খাওয়ার সঙ্গে স্যালাডের মধ্যে ‘গাজর’ আমাদের পরিবারের একজন চেনা অতিথি। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বারো মাসের গাজরের স্বাদের তুলনায় শীতকালের গাজরের স্বাদ একটু আলাদা হয়। তার ঝাঁঝ বা গন্ধটা বেশি হয়। আসলে ‘গাজর’ একটি মূল। এই মূলটি আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুইভাবেই খেতে পারি। গাজরের মধ্যে থাকে ভিটামিন ‘এ’। যা আমাদের রাতকানা থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে। গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, গাজর আমাদের সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি থেকে সুরক্ষিত করে। আবার চীনের মেডিকেল রিসার্চ জানাচ্ছে— গাজর আমাদের শরীরে অতিরিক্ত এনার্জি জোগায়। সেই অর্থে বলা যেতেই পারে— টাইম পাশ করার জন্য আলুর চিপস না খেয়ে একটা গাজর অনায়াসে খাওয়া যেতেই পারে।

গাজরের উপকারিতা :

(১) গাজর খেলে গায়ের চামড়া, চুল, নখ সুন্দর হয়। (২) প্রত্যেকদিন গাজর খেলে কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ কম হয়। (৩) গাজরের রস মাতৃদুগ্ধকে উন্নত করে। (৪) গাজরে উপস্থিত ‘বিটা ক্যারোটিন’ ক্যানসার থেকে মানুষকে দূরে রাখে। (৫) যদি প্রত্যেক দিন গাজরের রস পান করা যায়, তাহলে আমাদের শরীরের ইনফেকশন নষ্ট হয়ে যায়। (৬) দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতে গাজরের তুলনা নেই। (৭) মনোসংযোগ বাড়াতে গাজরের উপাদানগুলি যথেষ্ট সহায়তা করে। (৮) ব্লাডসুগারের সমতা রক্ষা করে গাজর। (৯) স্থূলত্ব প্রতিরোধে গাজরের জুস বা গাজর খাওয়া উচিত। (১০) আমাদের কিডনিকে সুস্থ রাখে গাজর।

এছাড়া রক্তকে শুদ্ধ করা, চোয়াল সমস্যার সমাধান, অ্যালজাইমা, আলসার সারাতে গাজরের ভূমিকা অসামান্য।

গাজর ব্যবহারে কতটা উপযোগী?

শক্তি উৎপাদনকারী ও রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য গাজর। গাজর আমরা সরাসরি কাঁচা খেতে পারি। সেই সঙ্গে গাজরের জুসও খাওয়া যায়। যার ফলে আমাদের ক্লান্তি কমে ও এনার্জি পাই।

গাজরের স্যুপ (বাড়িতে তৈরি) ডায়েরিয়ার জন্য দারুণ উপকারী। কারণ, আমাদের শরীরের ভেতরের ব্যাকটেরিয়াকে নষ্ট করে দেয়।

কোনো ক্ষত স্থানে কাঁচা গাজরের টুকরো লাগালে তা দ্রুত সেরে যায়।

ত্বকের জন্য গাজরের রস কতটা উপকারী?

গাজরের রস আমাদের শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। দিনে যদি দু’গ্লাস গাজরের রস খাওয়া যায়, তাহলে ৭০ শতাংশ ইমিউনিটি বাড়ে। এই জুস অনেক মিনারেল সমৃদ্ধ। গাজরের রসের সঙ্গে যদি পালং শাক অথবা বিটের রস যোগ করা যায় তবে সেটি আরও উপাদেয় হয়। যদি ত্বকে কোনো সমস্যা থাকে তাও সেরে যায়। এছাড়া গাজরকে রেফ্রিজারেটরে রাখা উচিত। যদি গাজরকে খোলা এবং ঘরের তাপমাত্রায় রাখা হয়, তাহলে গাজরের মধ্যে মিষ্টি রসের পরিমাণ উপযুক্ত মাত্রায় পাওয়া যাবে না। সবসময় গাঢ় রং-য়ের গাজর খাওয়া উচিত। কারণ তার মধ্যে ক্যারোটিন বেশি থাকে এবং যা থেকে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। গাজর কাঁচা চিবিয়ে খাওয়া সব থেকে উপকারী। যদিও সেদ্ধ করে গাজরও খাওয়া বেশ ভালো। সুতরাং নিজের শরীরকে সুস্থ রাখতে ক্যান্সার ও হৃদরোগ সংক্রান্ত সমস্যা থেকে দূরে থাকতে হলে গাজরকে নিত্য সঙ্গী করুন।

গাজরে উপস্থিত ভিটামিন ও মিনারেলগুলি :

ভিটামিন ‘এ’ ১২,০০০ আই ইউ, ভিটামিন ‘বি’, থিয়ামিন বি .০৬ এম জি, রাইবোফ্লোবিন .০৬ এম জি, নিয়াসিন .৫ এম জি, ভিটামিন ‘সি’ ৫ এম জি, ক্যালসিয়াম ৩৯ এম জি, আয়রন .৮ এম জি, ফসফরাস ৩৭ এম জি, ফ্যাট ০.৩ জি এম, কার্বহাইড্রেটস ৯.৩ জি এম, প্রোটিন ১.২ জি এম, ক্যালোরি ৪২। ■

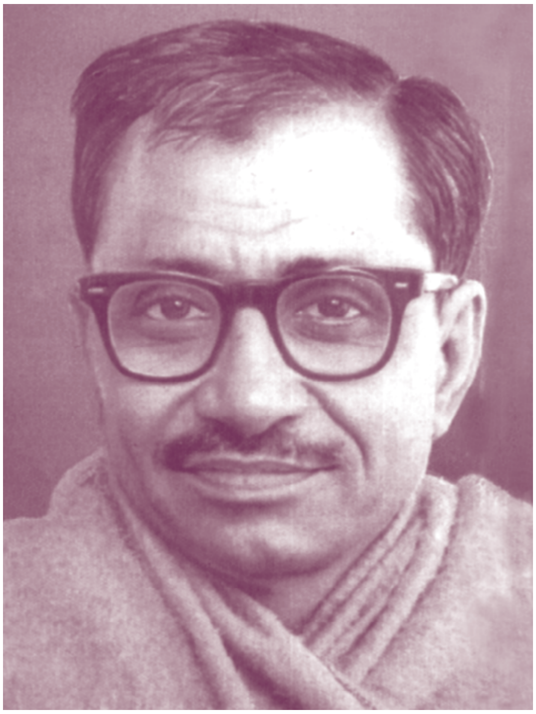

আমার দেখা

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

অজিত কুমার বিশ্বাস

সেটা ১৯৫৮-৫৯ সালের কথা। আমি তখন থাকতাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাদেশিক কার্যালয় ২৬ বিধান সরণীতে। সঙ্ঘ ও জনসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় অধিকারী প্রায় সকলেই তখন কলকাতায় ২৬ বিধান সরণীতেই থাকতেন।

সকাল তখন ৯টা হবে। আমি আর একজন স্বয়ংসেবকের সঙ্গে বিবেকানন্দ রোড-বিধান সরণীর মোড়ে স্যঙ্গুভ্যালি-তে বসে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দৃষ্টি গেল বিবেকানন্দ রোডের বিপরীত ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন ভারতীয় জনসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। হাতে একটা ছোট ব্যাগ। হাওড়া থেকে আসা ৮বি বাস থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে দীনদয়ালজীর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বললাম, 'আপনি একলাই আছেন?

'হাওড়া থেকে নেমে জানতাম ৮বি বাসে কার্যালয়ে যাব। তাই এখানে নামলাম।'

'চলুন আমি কার্যালয়েই থাকি।'

'কী নাম তোমার?' বললাম, 'আমার নাম অজিত বিশ্বাস। আমি কার্যালয়েই থাকি।'

তখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ড্রাফ্‌ট বের করেছে। দীনদয়ালজী তখন আবার কলকাতায় এসেছেন। উদ্দেশ্য ছিল একটি বই লেখা, 'The Two Plans'। এই সময় তিনি সাত দিন কলকাতায় ছিলেন। দীনদয়ালজীর জন্য তখন এন্টালিতে একজন স্বয়ংসেবকের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ওই বাড়িতে থেকে তিনি 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' যেতেন বই পড়ার জন্য। সকালে চলে যেতেন আবার বিকেলে ফিরে আসতেন। কোনো কোনো দিন সকালে কেশবজীর সঙ্গে চা খাবার সময় উপস্থিত হতাম। সেই সময় নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার এবং অনেক খবরাখবর জানার সুযোগ হোত। তখন সাতদিন দীনদয়ালজী এন্টালিতে থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে 'দি টু প্ল্যানস্' বইটা লেখা শেষ করে দিল্লী চলে যান।

দীনদয়ালজী উত্তর প্রদেশের সহ-প্রান্ত প্রচারক ছিলেন। জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। কানপুরে একই ঘরে নানাজী দেশমুখের সঙ্গে থাকতেন। দীনদয়ালজী ১৯১৬ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর মথুরায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাজস্থানের পিলানি থেকে আই এ পাশ করেন। স্কলারশিপ পান। পরে কানপুর থেকে বিএ এবং আগ্রা থেকে এমএ পাশ করেন। এই সময় ১৯৩৭ সালে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। তখন থেকে সমাজের কাজ করার মনস্থির করেন। এই সময় একটি চিঠি তিনি তাঁর মামাকে লেখেন। সেই চিঠি থেকেই তাঁর মানসিকতা বোঝা যায়। ১৯৪২ সালে এই চিঠি লেখেন :

"God has blessed our family with some means. Can we not offer at least one of our members for the service of the Nation? Having provided me with education, moral instruction and all sorts of qualifications can you not turn me over to the Samaj (society), to which we owe so much? This will hardly be any kind of sacrifice, it will rather be an investment. It is like providing the form of the Samaj with manure. We are now a days interested only in reaping the harvest and have forgotten to provide the field with manure. There is thus the danger of our land becoming barren and unproductive can we not forgo a few worthless ambitions for the protection and benefit of a Samaj and faith, for which Ram suffered exile, Krishna pose innumerable hardship, Rana Pratap wanderd about from forest to forest, Shivaji staked his all and Guru Govinda Singh allowed his little sons to be buried alive?" এই চিঠি থেকেই আমরা বুঝতে পারি তাঁর মানসিকতা। তিনি সারাজীবন মাতৃভূমির কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে চান।

কেমন ছিল তার জীবনচর্যা? একটা ঘটনা থেকে বুঝতে পারি। সঙ্ঘের প্রথম প্রচারক বাবাসাহেব আপ্টের কাছে এই ঘটনাটা

শুনেছিলাম। প্রচারক জীবনে দীনদয়ালজী কানপুরে একটি ঘরে থাকতেন। সেখানেই রান্নাবান্না করে খেতেন। সেখানে একদিন দীনদয়ালজী বাজার থেকে কিছু সবজি কিনে এনেছেন, সঙ্গে নানাজী দেশমুখও ছিলেন। দীনদয়ালজী হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে বললেন, 'নানা, খুব ভুল হয়েছে।

'কি ভুল?'

'আমার পকেটে ৪টি পয়সা ছিল। তার মধ্যে একটা পয়সা অচল ছিল। সেই অচল পয়সাটা, ওই সবজি বিক্রেতা বৃদ্ধা মহিলাকে দিয়েছি। মহিলা কী মনে করবেন? চল মহিলার কাছ থেকে অচল পয়সাটা নিয়ে ভাল পয়সা দিয়ে আসি।' নানাজী লিখছেন, 'দীনদয়ালজীর মুখে যেন একটা অপরাধবোধ দেখা দিল।'

দীনদয়ালজী সেই বৃদ্ধাকে বললেন অচল পয়সাটি ফেরত দিতে। ''অত পয়সার মধ্যে কোথায় পাব ওই পয়সাটা?'' দীনদয়ালজী বসে পড়ে বৃদ্ধার পয়সার থলিটা খুলে সেই অচল পয়সাটা খুঁজে বের করলেন। দীনদয়ালজী অত্যন্ত তৃপ্ত হলেন সেই অচল পয়সা উদ্ধার করে। সেই বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি খুবই ভাল ছেলে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।' দীনদয়ালজীকে দেখে আর এস এস কী ধরনের মানুষ তৈরি করেছে তা আমরা বুঝতে পারি। কোনো মানুষকে যেন ১টি পয়সাও ঠকানো না হয়।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কানপুরে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখালেন। কয়েকজন সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কৃত করলেন। আজ মনে পড়ছে সেই তিনজন এমএলএ-র একজন ছিলেন ভয়রোঁ সিং শেখাওয়াত। পরবর্তীকালে যিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

ষাটের দশকে দীনদয়ালজী বিদেশ ভ্রমণ করে কলকাতায় এসেছেন। তখন আমি বিবেকানন্দ নগরের কার্যবাহ ছিলাম, ২৬ বিধান সরণীর সঙ্ঘ কার্যালয়েই থাকতাম। তাই সুযোগ বুঝে দীনদয়ালজীর একটি বৌদ্ধিকের কার্যক্রম রাখলাম। একদিনের সূচনায় প্রভাত বিভাগের তিনটি শাখার মিলিত কার্যক্রম। স্থান ঠিক হলো ২৬নং নিবাসের ছাদে। দরজা দিয়ে প্রবেশ করেই ছাদে কার্যক্রম ছিল। ছাদটা ফাঁকাই ছিল। ছিল ৫০ জন স্বয়ংসেবক। সেখানেই তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শুনলাম। আমেরিকায় বালক-বালিকাদের সামনে রামায়ণের গল্প বলেছিলেন। রাম-রাবণের সেই ভয়ানক যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছিলেন। তখন আমেরিকার ছোটদের মানসিকতার কথা বলছিলেন। ছেলে-মেয়েরা দীনদয়ালজীকে সেখানে প্রশ্ন করে, রাম-রাবণের এই বিরাট যুদ্ধের কী প্রয়োজন ছিল, রাম যদি সীতাকে ডিভোর্স দিত তা হলে এত বিরাট যুদ্ধ হোত না।

দীনদয়ালজী আমাদের বললেন ভারতের ছেলেমেয়েরা কখনও এই ধরনের কথা চিন্তাই করতে পারবে না। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব মানুষকে কীভাবে পালটায়। দীনদয়ালজী বলছিলেন, 'আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম মথুরার বিখ্যাত পেড়া আর গঙ্গাজল। সেখানে ভারতীয়রা এই সামান্য প্রসাদ পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিল।'

দীনদয়ালজী অসামান্য অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তিনি যখন বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়। দীনদয়ালজীর চিন্তা ছিল ভারতের উন্নয়ন। এই সময় ভারতীয় জনসঙ্ঘ দুটো বিষয় নিয়ে দেশে আন্দোলন করছিল। একটি বিষয় ছিল, 'ভারতে ফুল এমপ্লয়মেন্ট' এবং দ্বিতীয় বিষয় ছিল ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য চাই 'অ্যাটম বোমা'। হার্ভার্ডে গিয়ে দীনদয়ালজী একজন তরুণ অধ্যাপককে পেলেন। যিনি এই দুটো বিষয় নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তার নাম ড. সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। ড. স্বামীর co-authership-এ দুজন তখন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

দীনদয়ালজীর সঙ্গে পরিচয় হলো ড. স্বামীর। অনেক বিষয়ে কথা হওয়ার পর তিনি তাঁকে ভারতে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ড. স্বামীও সেই আমন্ত্রণ স্বীকার করলেন ভারতে এসে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

দীনদয়ালজী চেয়েছিলেন ড. স্বামীকে Delhi School of Economics-এ অধ্যাপনার কাজে যুক্ত করবেন। ভারতে আজকের মতো সেদিনও Economics এবং History বিভাগে কমিউনিস্টদের প্রভাব এত বেশি যে সেখানে কমিউনিস্ট ছাড়া কারো প্রবেশ নিষেধ। আজো সেই ধারা চলছে।

দীনদয়ালজী যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন তখনও অনেক বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। তাঁদেরও কয়েকজনকে ভারতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখন একটি নাম মনে পড়ছে। ডাঃ নারায়ণ স্বরূপ শর্মা।

দীনদয়ালজী যখন উত্তরপ্রদেশে প্রচারক ছিলেন তখন তিনি 'রাষ্ট্রধর্ম' নামে বিখ্যাত কাগজের প্রকাশক এবং সম্পাদক ছিলেন। প্রায় একক প্রচেষ্টায় সেই কাগজ তিনি প্রকাশ করতেন। একটা সংখ্যা প্রকাশের দিন দেখলেন ছাপার মতো কোনো লেখা নেই। তখন সারা রাত জেগে দুটো কাহিনি লেখেন— 'চন্দ্রগুপ্ত' এবং 'শঙ্করাচার্য'।

১৯৫৪ সালের কথা, আমি তখন কল্যাণগড়-হাবরায় থাকি। অর্গানাইজার পত্রিকা পড়া শুরু করেছি। প্রতি সোমবার কল্যাণগড় পোস্ট অফিসে গিয়ে হাজির হতাম। প্রথমের ডাকে 'অর্গানাইজার' এসেছে কিনা। তার প্রথম লেখা পড়তাম দীনদয়ালজীর লেখা 'পলিটিক্যাল ডায়েরি'।

অনেক কথাই মনে পড়ছে। ১৯৬৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আমরা ২৬নং নিবাসে সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছি। ভোজন মন্ত্র শেষ হলো, তখন একটি ফোন এল। সঙ্গে খবর এল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত দেহ মোগলসরাই রেল স্টেশনে পাওয়া গেছে। উঠে পড়লাম বাকি খবরের জন্য।

থাকে যদি
ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
50g
TURMERIC
POWDER
DUTA
CUMIN
POWDER
TURMERIC
POWDER
CORIANDER
POWDER
RED CHILLI
POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

অলিম্পিকের লক্ষ্যে

কবিতা রাউত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অখিল ভারত বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ক্রীড়া প্রকল্পের আর এক সফল আবিষ্কার কবিতা রাউত। বিশ্ববিখ্যাত তিরন্দাজ লিম্বারাম, শ্যামলাল, অলিম্পিক ও বিশ্বকাপে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক তথা রাজ্যসভার সাংসদ দিলীপ তিরকে, অ্যাথলিট বুধুয়া ওরাঁওয়ের পর এবার অলিম্পিকের বিশ্বমঞ্চে কবিতা রাউত। কবিতা ইতিমধ্যেই এশিয়স্তরে প্রতিষ্ঠিত অ্যাথলিট। ২০১০-এ ওয়াংজো এশিয়াডে দূরপাল্লার দৌড়ে সোনা জিতে মহাদেশীয় অ্যাথলেটিক্সে নিজের প্রতিষ্ঠার ভিতটি শক্ত ভাবে গড়ে নিয়েছিলেন। এরপর অলিম্পিকের লক্ষ্যে নিজেকে তিল তিল করে তৈরি করেছেন। সম্প্রতি গুয়াহাটির সাফ গেমসে ম্যারাথনে সোনা জিতে রিও অলিম্পিকে ম্যারাথনে নামার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছেন কবিতা। রিওতে তার সঙ্গে দৌড়বেন ললিতা বব্বর, সুধা সিং, ওপি জৈশ। এটা ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের পক্ষে গৌরবময় অধ্যায়। অলিম্পিকে অংশগ্রহণের স্বপ্ন পূরণ হবার পর সাংবাদিক সম্মেলনে কবিতা জানিয়েছেন তার আবেগ, অনুভূতির কথা।

‘সাফ গেমসে সোনা পাওয়া আর একই সঙ্গে রিও-র টিকিট পাওয়া আমার কাছে অলীক মরীচিকাকে দু'হাত দিয়ে তালুবন্দি করার মতো কল্পবাস্তব ঘটনা। দেশকে অলিম্পিকের মতো আসরে তুলে ধরাই এখন আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এবছর ফুল ম্যারাথনে আমার সেরা সময় ২ : ৩৮:৩৮ যা অলিম্পিকে লড়াই দেওয়ার মতো অবস্থান। আমার কোচ, ট্রেনার, সাপোর্ট স্টাফ-সহ পরিবার পরিজন সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি, তাই এতবড় স্বপ্ন সফল করতে পেরেছি। গত এক বছর প্রচুর পরিশ্রম করেছি। প্রতিদিন সকাল বিকেল মিলিয়ে পাঁচ ঘণ্টা অনুশীলন করার সুফল মিলেছে। আমার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা অনেক বেড়ে গেছে। অলিম্পিকে নামার আর দেশের পতাকাকে আরো উঁচুতে তুলে ধরাই একমাত্র অঙ্গীকার যা পূরণ করতে জীবন বাজি রাখতেও রাজি।’

তার উঠে আসার পিছনে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন কবিতা। কথা প্রসঙ্গে অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর। ‘‘আমি মহারাষ্ট্রের থানাপাদার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে এসেছি। ঘন জঙ্গল, রুক্ষ প্রকৃতি আর সহজ সরল জনজাতি জীবন ও সমাজ আমার মননকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে শৈশবেই। শিশু বয়স থেকেই আপন খেয়ালখুশি মতো দৌড়ে বেড়াতাম। কাঠিন্য ও সংগ্রামলব্ধ জীবন তখন থেকেই নিজের আত্মপ্রত্যয় ও সংকল্পের ভিতটি শক্ত করে গড়ে দেয়। একটু বড় হতে হারসুলের বিশ্ব হিন্দু বোর্ডিং স্কুলে চলে আসি। স্কুলের অ্যাথলেটিক্সে আমার দৌড় দেখে রাজ্যের স্বীকৃত কোচ বিজেন্দ্র সিং দৌড়কে জীবনের অঙ্গ করে নেওয়ার জন্য মূল্যবান পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় গাইডলাইন দেন। তবে স্কুলজীবনে শুধু দৌড় নয়, নানারকম খেলায় অংশগ্রহণ করতাম। আর সেই সূত্রে নতুন নতুন জায়গায় ভ্রমণের সুযোগ হোত। ঘুরে বেড়ানোর নেশা রয়েছে আমার। যা খেলার সূত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ভ্রমণের শিক্ষাও আমাকে অনেক পরিশীলিত করেছে।

তবে অ্যাথলেটিক্সকে কেরিয়ার করার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে বাবা-মা'র সম্মতি ছিল না। প্রায় দু'বছর নিরন্তর বোঝানোর পর তাঁদের সম্মতি মেলে আর সেই সূত্র ধরে ভাল প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধে মোতাবেক আমি বড় শহর নাসিকে চলে আসি। নাসিকে কোচ বিজেন্দ্র সিংহের বাড়িতে থাকতাম তার পরিবারের একজন সদস্য হয়ে। নাসিকেই আমার আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণ শুরু হয়। তিন মাসের মধ্যে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হই আর তারপর থেকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বেঙ্গালুরুর জাতীয় শিবিরে ডাক পাই এবং দিল্লী কমনওয়েলথ গেমসে দলভুক্ত হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক বৃহৎ মঞ্চে নামার স্বাদ অনুভব করি।’ এর পর পরই চীনের ওয়াংজোতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ১০০০০ মিটারে সোনা জিতে ইতিহাস রচনা— সব যেন অঙ্কের নিয়মে পরপর ঘটে যায়। এ সব কিছুই হয়েছে কোচ বিজেন্দ্র সিংহের সর্বাত্মক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। আর অবশ্যই বলতে হয় পরিবারের সকলের সহমর্মিতার কথা।

একই সঙ্গে তার স্বামী মহেশ কুমার টাঙ্গার ও কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তাদের ভূমিকার কথাও অনস্বীকার্য। স্কুল স্তরে কল্যাণ আশ্রমের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় দৌড়বার সুযোগ ও পরবর্তী পর্যায়ে তাদের অ্যাথলেটিক্স ট্রেনিং সেন্টারে থেকে সাই কোচেদের কাছে প্রাপ্ত শিক্ষাই তার বুনিয়াদ গড়ে দিয়েছে বলে স্বীকার করেন কবিতা। কল্যাণ আশ্রমের বরিষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠকরা তার মধ্যে অলিম্পিকে অংশগ্রহণের স্বপ্ন বুনে দিয়েছিলেন এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অ্যাথলিট হবার পথটি প্রশস্ত করেছেন। তাই অ্যাথলেটিক্স চর্চা ও নিয়মিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিটে নামার পাশাপাশি কবিতা কল্যাণ আশ্রমের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একলব্য অ্যাথলেটিক্স এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। একটাই লক্ষ্য বনবাসী বা জনজাতি ছেলে-মেয়েদের অ্যাথলেটিক্স, তিরন্দাজি ও অন্যান্য খেলার সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত দক্ষতা ও উদ্দীপনার যথোপযুক্ত বিকাশ ও প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা।

শব্দরূপ-৭৮৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

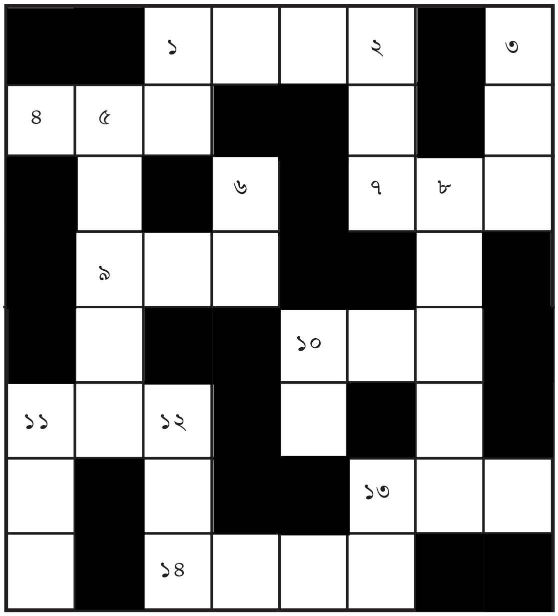

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. চিঁড়া দই দুধ মিষ্টান্ন ফল ইত্যাদি আহার অথবা ভাত ছাড়া অন্য নিরামিষ দ্রব্য আহার, **৪.** কাঁচা আম সরিষা ইত্যাদির আচার, **৭.** সূর্য, **৯.** রাত্রি, **১০.** বৃহৎ-চঞ্চু পাখি; কুবের, **১১.** গুরুড়ের জননী; কশ্যপ-পত্নী, **১৩.** 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে—' (বাগ্‌ধারা), **১৪.** 'খাঁচার ভিতর অচিনপাখি কম্‌নে আসে যায়/ধরতে পারলে — দিতেম তারি পায়'।

উপর-নীচ : ১. কূটকৌশল; মতলব, **২.** রৌপ্য, **৩.** 'কালোমেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর —', **৫.** বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ অরণ্য, **৬.** বিড়ালী (আদরে), **৮.** জৈন তীর্থঙ্কর; ওই নামে পাহাড় (ছোটনাগপুরে), **১০.** স্বামী, **১১.** দেশত্যাগী; সংসারত্যাগী, **১২.** শিক্ষা, উপদেশ, **১৩.** পার, উত্তরণ ('নদী, সাগর — দেওয়া')।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮৩
সঠিক উত্তরদাতা
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
মিঠুন নন্দী
পুরুলিয়া

দু	■	■	কু	ম্ভ	ক	র্ণ	■
র	■	■	ম্ভ	■	পি	■	■
ক্ষ	প	ণ	ক	■	ধ্ব	■	■
■	ব	■	■	আ	জ	ব	■
■	ন	কু	ল	■	■	ড়	■
■	■	শ	■	মা	র্গ	শি	র
■	■	ধ্ব	■	রু	■	■	ক্ষ
■	গ	জ	প	তি	■	■	ক

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭৮৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ মে ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হলো তার ধ্যেয় পূর্ণ ভাব। যখন এক মনুষ্য সমুদায়ের সামনে এক লক্ষ্য, এক বিচার, এক আদর্শ থাকে এবং সেই সমাজ এক ভূমি বিশেষকে মাতৃজ্ঞানে কল্পনা করে তখন তাকে রাষ্ট্র বলে। এর মধ্যে কোনো একটি গুণের অভাব থাকলে তা রাষ্ট্র হয় না।

রাষ্ট্রের জন্য চারটি বিষয় আবশ্যক। প্রথমত, ভূমি ও জনমানস— যাকে আমরা দেশ বলি। দ্বিতীয়ত, সকলের ইচ্ছাশক্তি তথা সামূহিক জীবনের সংকল্প। তৃতীয়ত, একটি উত্তম ব্যবস্থা বা সংবিধান বলা যায় যাকে--- 'ধর্ম' বললে আরও ভাল হয়। চতুর্থত, জীবন-আদর্শ। এই চারটি বিষয়ের সমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়। যেমন ব্যক্তির মধ্যে শরীর, মন, বুদ্ধি, আত্মা থাকা জরুরি, সেইরকমই দেশ, সংকল্প, ধর্ম ও আদর্শ মিশিয়ে রাষ্ট্র নির্মাণ হয়।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২৩

দুধ-ভেজালে লাগাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া (FSSAI) ৬০ বছর পর মিল্ক সেফটি স্ট্যান্ডার্ড পুনর্লাগু করতে চলেছে। এর ফলে দুধে ভেজাল মেশানোর ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব হবে। FSSAI-এর মতে, দেশে উৎপাদিত ৬৮ শতাংশ দুধে ভেজাল মেশানো হয়। দুধে রিফাইন্ড ওয়েল, কস্টিক সোডা, সাদা রং এবং ডিটারজেন্ট মেশানো হচ্ছে তা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। দুধের ভেজাল পরীক্ষার জন্য একটি স্ক্যানার তৈরি করা হয়েছে, যা ৪০ সেকেন্ডে দুধের ভেজাল পরীক্ষা করতে সক্ষম। এতে নমুনা পরীক্ষার জন্য মাত্র ১০ পয়সা খরচ হবে। সংস্থার মতে, খুব শীঘ্র জেলাস্তরে এই স্ক্যানার পাওয়া যাবে। এতে আলাদা করে কেমিক্যাল পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না।

চীনে যোগ কলেজে অভূতপূর্ব উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনে যোগ কলেজ। ভাবা যায়! একেই বলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্ব সঞ্চার। গত বছর মে মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী চীন সফরের সময় চীনে যোগ

কলেজ খোলা ও তার জন্য দু'জন যোগ শিক্ষক পাঠিয়ে সহযোগিতার বার্তা দিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই নরেন্দ্র মোদী তাঁর কথা রাখেন। গত নভেম্বর মাসে চীনের কুনমিং জেলার উন্নান মিঞ্জু ইউনিভার্সিটিতে এই যোগ কলেজ শুরু হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই ভারত-চীন যোগ কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর, এখন পর্যন্ত তিন হাজার ছাত্র যোগ ক্লাসে অংশ নিয়েছে। কলেজের উপনির্দেশক লু ফেংগ জানিয়েছেন, ৬০ জনের বেশি ছাত্র যোগের কোর্স সমাপ্ত করে শংসাপত্র পেয়েছে। উল্লেখ্য, এই কলেজ যোগের ওপর কোনো ডিগ্রি প্রদান করবে না। ছাত্ররা অ্যাডভান্স কোর্সের জন্য ভারতের যে-কোনো কলেজে পড়তে পারবে।

পথপ্রদর্শক ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শরণার্থী সমস্যার সমাধান কীভাবে করতে হয় ভারতের কাছ থেকে ইউরোপের শেখা উচিত। সম্প্রতি ভিয়েনায় অস্ট্রিয়ার বিদেশ মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক হার্বার্ট ক্রাউস মন্তব্যটি করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ইউরোপ এখন শরণার্থী সমস্যায় জেরবার। ক্রাউস আরও বলেন, 'ভারতেও শরণার্থী সমস্যা আছে। কিন্তু ভারত সরকার সমস্যার সমাধানে অসাধারণ কাজ করছে।'

বিদেশে সমাদৃত গীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতবর্ষে রচিত হয়ে খোদ ভারতের বুকেই যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আর কমিউনিস্টদের কাছে গীতা সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক বলে বিবেচিত হয়, তখন বিদেশে এর কদর ক্রমেই বাড়ছে। এদেশে যুগে যুগে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত এসেছেন এবং গীতাজ্ঞান লাভ করেছেন। কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শপথ নেওয়ার সময় শ্রীমদ্ভগবত গীতা স্পর্শ করার ছবিটা আমাদের চোখে বড় বেমানানই দেখায়। তবুও বর্তমানে এরকম ছবি বিদেশের মাটিতে বাস্তব রূপ পাচ্ছে। তুলসী গাবার্ডের পর আবার এই নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকা সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি অ্যান্টোনিন স্কালিয়ার মৃত্যুর পর ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডিসি আপীল কোর্টের বিচারপতি শ্রী শ্রীনিবাসনকে বসানো নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ২০১৩ সালে শ্রীনিবাসন আপীল কোর্টের বিচারপতি পদে শপথ নেওয়ার সময় গীতায় হাত রেখে শপথ বাক্য পাঠ করেছিলেন। হাওয়াই দ্বীপের প্রথিতযশা কংগ্রেস উইম্যান তুলসী গাবার্ডও এই একইভাবে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ইউরো-আমেরিকান মায়ের প্রভাবে হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং তিনি আশা করেন যে তাঁর কংগ্রেসে উপস্থিতি একদিন সকলকে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বোঝার এবং আমেরিকার এই ধর্মকে আলিঙ্গন করার ক্ষেত্রে একটি কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেরই সার্জেন জেনেরাল বিবেক মূর্তি, শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাষ্ট্রদূত অতুল কাশ্যপও গীতা স্পর্শ করে শপথ বাক্য পাঠ করেন। তবে শ্রীনিবাসন এবং শ্রীমূর্তি উভয়েই তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে সবসময় নীরবই থেকেছেন। অন্যদিকে ড্যানিয়েল মুখেই প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ার আইনসভার সদস্য যিনি গীতায় হাত রেখে শপথ নিয়েছিলেন। এমনকী তিনিও তুলসী গাবার্ডের মতো আশাবাদী যে এরপরে আরও বেশি ভারতীয় এবং অন্যান্য জাতির বংশোদ্ভূতরা এই একইভাবে শপথ নেবেন।

জার্মানিতে ৩২ হাজার বছরের নৃসিংহমূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি পুরাতত্ত্ববিদরা জার্মানির এক গুহায় ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহমূর্তির সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের দাবি, মূর্তিটি আনুমানিক ৩২ হাজার

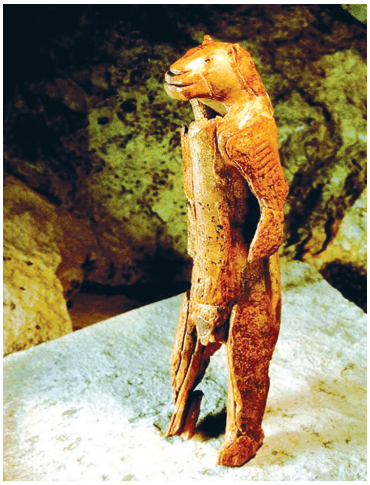

বছরের পুরনো। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদদের মতে, এই মূর্তিটি কোনো মন্দিরের প্রধান দেবতা। মূর্তিটি বৈশিষ্ট্য হলো, জার্মানিতে পাওয়া অন্য মূর্তির থেকে এটি আলাদা। মূর্তিটি মার্বেল পাথরের।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
9 May - 2016 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা